এই সভা সম্বন্ধে একটী স্মরণীয় ঘটনা আছে। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এই সভার একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। একদিন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের এক বক্তৃতাতে প্রসিদ্ধ ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজনীতিতে টোরীদলভুক্ত লোক ছিলেন। যুবকদলের অতিরিক্ত স্বাধীন চিন্তা তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি উক্ত বক্তৃতাতে বিরক্ত হইয়া তাহা থামাইয়া দেন; এবং এই যুবকদলকে চক্রবর্ত্তী ফ্যাকশন, (Chuckerbutty Faction) বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করেন। ১৮৪৩ সালে যখন জর্জ্জ টমসন্ এদেশে আসেন তখন ইঁহারা চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্‌শন নামে প্রসিদ্ধ।

বক্তাদিগের মধ্যে প্রসন্ন কুমার মিত্র এই সময়কার নব-প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কালেজের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে একজন বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের ন্যায় মেডিকেল কালেজ স্থাপনও এই সময়কার একটী প্রধান ঘটনা। অগ্রে এদেশীয়দিগকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ আয়োজন ছিল না। ইংরাজ ডাক্তারগণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় হস্পিটাল এসিষ্টাণ্ট প্রেরণ করা আবশ্যক হইত। তাই একদল এদেশীয় হস্পিষ্টাল এসিষ্টাণ্ট প্রস্তুত করিবার জন্য "মেডিকেল ইনষ্টিটিউশন" নামে একটী সামান্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সেখানে হিন্দুস্থানী ভাষাতে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রের কতকগুলি ঔষধ ও তাহার গুণাবলী বিষয়ে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন উপদেশ দেওয়া হইত মাত্র। ডাক্তার টাইট্‌লার (Dr. Tytler) ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। যে ১৮৩৪ সালের কথা বলিতেছি, তখন Dr. Ross ঐ বিদ্যালয়ে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার উপদেষ্টা ছিলেন। ছাত্রদিগকে তিনি যে উপদেশ দিতেন তাহাতে সোডার গুণ সর্ব্বদাই ব্যাখ্যা করিতেন। ফলতঃ বোধ হয় তিনি সোডা-তত্ত্ব ব্যতীত অপর পদার্থতত্ত্ব বড় অধিক জানিতেন না। যখন তখন সোডার মহিমা শুনিয়া শুনিয়া ছাত্রেরা এমনি বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল যে তাহারা তাঁহার নাম সোডা রাখিয়াছিল! নব্যবঙ্গের নেতৃগণ এই সোডাকে লইয়া সর্ব্বদা কৌতুক করিতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে "Soda and his Pupils" এই শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন। Dr. Tytler একজন প্রাচ্যপক্ষপাতী ও উৎকেন্দ্র লোক ছিলেন। এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষাতে চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইতে তাঁহার ইচ্ছা

ছিল না। এই কারণে কর্ত্তমান মেডিকাল কালেজ স্থাপনের সময় তিনি বড় বাধা দিয়াছিলেন।

যাহা হউক সে সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত মেডিকেল ইনষ্টিটিউশন চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার একমাত্র স্থান ছিল না। পাঠকগণ অগ্রেই জানিয়াছেন যে সংস্কৃতকালেজে চরক ও সুশ্রুতের শ্রেণী এবং মাদ্রাসাতে আবিসেন্নার শ্রেণী খুলিয়া দেশীয় বৈদ্যকশাস্ত্র শিক্ষা দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। মেডিকেল কালেজ স্থাপন পর্য্যন্ত এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু ইংরাজ রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিলাত হইতে বহু অর্থ দিয়া এত ডাক্তার আনা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ এদেশীয়দিগকে ইংরাজী প্রণালীতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতে লাগিলেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের প্রকৃতি এই ছিল যে তিনি সহজে কোনও নূতন পথে পা দিতে চাহিতেন না; কিন্তু কর্ত্তব্য একবার নির্দ্ধারিত হইলে, বীরের ন্যায় অকুতোভয়ে সে পথে দণ্ডায়মান হইতেন, তখন আর বাধা বিপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার চরিত্রের এই গুণের প্রমাণ মেডিকেল কালেজ স্থাপনেও পাওয়া গেল।

১৮৩৪ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যার অবস্থা অবগত হইবার জন্য সে সময়ের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এক কমিশন নিয়োগ করিলেন। সুবিখ্যাত রামকমল সেন মহাশয় ঐ কমিশনের একজন সভ্য ছিলেন। সভ্যগণ নানা জনের সাক্ষ্য লইয়া ও নানা স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে এদেশীয়দিগকে ইউরোপীয় প্রণালীতে ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটী মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তদনুসারে ১৮৩৫ সালের জুনমাসে মেডিকেল কালেজ খোলা হয়। ডাক্তার ব্রাম্‌লি (Dr. Bramley) ইহার প্রথম অধ্যক্ষ হন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ১৮৩৭ সালে মহামতি হেয়ার ইহার সম্পাদক হন। তাঁহারই প্ররোচনাতে তাঁহার ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত সর্ব্বপ্রথমে মৃতদেহব্যবচ্ছেদ করিবার জন্য অগ্রসর হন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি এই মৃতদেহ-ব্যবচ্ছেদ লইয়া সে সময়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বেন্টিঙ্ক মহোদয় সে সময়ে এ দেশে ছিলেন না। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মার্চ্চ মাসের শেষে তিনি কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া স্বদেশে

প্রত্যাবৃত্ত হন। লাহিড়ী মহাশয় হেয়ারের পরামর্শে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণকে ঐ কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন এবং বিধিমতে তাঁহার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হন। নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ শব-ব্যবচ্ছেদকারী ছাত্রগণকে রীতিমত উৎসাহ দিয়া এই নবপ্রতিষ্ঠিত কালেজকে সবল করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আরও কতকগুলি শুভানুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়, তাহার সহিত নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দের অল্পাধিক পরিমাণে যোগ ছিল। তাহার কতকগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম, ১৮৩৪ সালে সহরের বড় বড় ইংরাজ ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক সম্মিলিত হইয়া টাউনহলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্য এক সভা করেন। তাহাতে নব্যবঙ্গের অন্যতম নেতা রসিককৃষ্ণ মল্লিক একজন বক্তা ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে ১৮৩৪ সাল হইতেই তাঁহারা সহরের বড় বড় কাজে হাত দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়, ১৮৩৬ সালে কলিকাতাবাসী ইংরাজ ও ভদ্রলোকদিগের সাহায্যে বর্ত্তমান "কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি" স্থাপিত হয়। এই শুভানুষ্ঠান হওয়াতে ডিরোজিওর শিষ্যদল আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিলেন এবং সর্ব্বদা লাইব্রেরিতে গতায়াত ও পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই দলের অন্যতম সভ্য প্যারীচাঁদ মিত্র লাইব্রেরির প্রথম দেশীয় কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইলেন। ইহাই তাঁহার ভবিষ্যতের সর্ব্ববিধ উন্নতির কারণ হইল। ১৮৪৪ সালে লর্ড মেটকাফের স্মরণার্থ বর্ত্তমান মেটকাফ হল নির্ম্মিত হইলে উক্ত লাইব্রেরি সেখানে উঠিয়া আসে।

তৃতীয় শুভানুষ্ঠান ইংলণ্ডে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী স্থাপন। রামমোহন রায়ের বন্ধু আডাম সাহেবের সহিত এই যুবকদলের বড় মিত্রতা ছিল। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তিনি ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া অনেক কাজ করিতেন। তাঁহার ভবনে মধ্যে মধ্যে যুবকদলের সম্মিলন হইত। আডাম ঠিক কোন্ সালে স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডে গিয়াও ভারতবর্ষকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ১৮৩৯ সালের জুলাই মাসে, প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে, ইংলণ্ডে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে একটী সভা স্থাপিত হয়। ভারতবাসীর সুখ দুঃখ ইংলণ্ডের লোকের গোচর করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই সভা জর্জ্জ টমসন, উইলিয়াম এডনিস, মেজর জেনারেল বিগ্‌স্ প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া

ইংলণ্ডের নানাস্থানে ভারতবর্ষ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াইতে আরম্ভ করেন; এবং ১৮৪১ সালে British Indian Advocate নামে এক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। এডাম সাহেব তাহার সম্পাদক হন। এই সভা স্থাপিত হইলেই রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি পত্রযোগে আডামকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন এবং বোধ হয় প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেও ত্রুটী করেন নাই।

চতুর্থ অনুষ্ঠান বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন। দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইলে এবং হিন্দুকালেজের উন্নতি হইলে, কালেজ কমিটী অনুভব করিতে লাগিলেন যে তাঁহাদের শিশুশিক্ষা শ্রেণীটী স্বতন্ত্র করিয়া একটী বাঙ্গালা পাঠশালা রূপে স্থাপন করিলে ভাল হয়। মহামতি হেয়ার এ বিষয়ে অতিশয় উৎসাহিত হইলেন এবং রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিকেও উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের সকলের চেষ্টাতে ১৮৩৯ সালের ১৪ই জুন দিবসে বাঙ্গালা পাঠশালার গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হেয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি উপস্থিত ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন।

পঞ্চম অনুষ্ঠান মেকানিকাল ইনষ্টিটিউট্ নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপন। সহরের বড় বড় ইংরাজ ও বাঙ্গালি ভদ্রলোকগণ উহার উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৩৯ সালের প্রথম ভাগে টাউন হলে একটী মহাসভা হইয়া ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এদেশীয়দিগকে শ্রমজাত শিল্প শিক্ষা দেওয়া ঐ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্যালয়টী মহা আড়ম্বর করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিক দিন টেঁকে নাই। নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ যে এ বিষয়ে উৎসাহী হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই কালের উল্লেখযোগ্য সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশেষ অনুষ্ঠান মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান। এই মহাকার্য্যে যুবকদলের প্রধান হাত ছিল। তাঁহারা ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের পূর্ব্বে এই ১৮৩৪ সালের ৫ই জানুয়ারি দিবসে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিবার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক একজন বক্তা ছিলেন। সুতরাং সে আন্দোলনে নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ যোগ দিয়াছিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত একটি জ্ঞাতব্য বিষয়।

১৭৮০ সালে সর্ব্ব প্রথমে "হিকীর গেজেট" (Hickey's Gazette) নামে একখানি ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপত্র বাহির হয়। তৎপরেই বেঙ্গল জর্ণাল (Bengal Journal) নামে আর একখানি কাগজ প্রকাশিত হয়। এই দুই-

খানিতেই এরূপ অভদ্র ভাষা ব্যবহৃত হইত যে, ১৭৯৪ সালে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ বেঙ্গল জর্নালের সম্পাদক মেং উইলিয়াম ডুইএনকে (W. Duane) ধরিয়া বন্দী করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে কিছুদিন যায়। পরে যখন টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ বাঁধে এবং সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে ইংরাজদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়, তখন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড ওয়েলেস্‌লি বিধিমতে সংবাদ পত্র পরীক্ষার রীতি (Censorship) স্থাপন করেন। এই বিধি অনুসারে প্রত্যেক প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে দেখাইয়া মুদ্রিত করিতে হইত; ১৮১৩ সালে এই নিয়মকে আরও কঠিন করা হয়। ১৮১৮ সালে লর্ড হেষ্টিংস এই নিয়ম এক প্রকার রহিত করেন। তাহার ফলস্বরূপ নূতন নূতন কাগজ দেখা দেয়। তন্মধ্যে এই ১৮১৮ সালে কলিকাতা জর্ণাল (Calcutta Journal) নামে এক কাগজ বাহির হয়। বকিংহাম (Buckingham) নামক একজন ইংরাজ তাহার সম্পাদক ও স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট (Sandford Arnot) নামে একজন ইংরাজ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তদানীন্তন গবর্ণমেণ্টের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ সংবাদপত্রের সমালোচনা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া লর্ড হেষ্টিংসকে মুদ্রাযন্ত্রের শাসনের জন্য বার বার উত্তেজিত করিতে থাকেন; কিন্তু সেই উদার-নৈতিক রাজপুরুষ তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। এই পরামর্শদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন জন এডাম, ইনি পরে কিছুকালের জন্য গবর্ণর জেনেরালের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

১৮২৩ সালে যখন জন এডাম গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত, তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লইয়া আবার গোলযোগ উঠে। ডাক্তার ব্রাইস (Dr. Bryce) নামক গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত একজন কর্ম্মচারীকে আক্রমণ করাতে গবর্ণর জেনেরাল কলিকাতা জর্ণাল নামক পত্রের সম্পাদক বকিংহাম সাহেবকে দুই মাসের মধ্যে ভারত ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। ইহার কিছুদিন পরে ঐ পত্রের সহকারী সম্পাদক (Sandford Arnot) কে ধরিয়া অব্যবহিত পরগামী জাহাজে তুলিয়া বিলাতে রওয়ানা করা হয়। ইহার পরেই এই প্রশ্ন উঠে, ইংরাজকে যেন স্বদেশে ফিরিয়া পাঠান হইল, কিন্তু ইরুঁস, পিঁদ্রুস, বা গমিস নামক কোনও ফিরিঙ্গী সম্পাদক ঐরূপ অপরাধ করিলে কি করা হইবে? তাঁহাকে কি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিলাত দেখাইয়া আনা হইবে? এই সংকট মোচনের উদ্দেশে এডাম মুদ্রা-

যন্ত্রের শাসনার্থ তাড়াতাড়ি এক কড়া আইন প্রণয়ন করেন; এবং তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লন। যখন এই নূতন বিধি প্রণীত হয় তখন রামমোহন রায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ হইতেছে দেখিয়া স্বদেশ-বাসীদিগকে এই নূতন রাজবিধির বিরুদ্ধে উত্থিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে তিনি ও দ্বারকানাথ ঠাকুর মিলিয়া বারিষ্টারের সাহায্যে, সুপ্রিমকোর্টে বিচার উপস্থিত করেন; এবং যাহাতে সুপ্রিমকোর্টের অনুমোদিত না হয় তাহার চেষ্টা করেন। সেখানে অকৃতকার্য্য হইয়া ইংলণ্ডাধিপতির নিকট এক আবেদন প্রেরণ করেন। কিছুতেই কিছু হয় নাই।

তৎপরে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক মহোদয় যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন, এবং ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশানুসারে সাহসের সহিত সৈন্যবিভাগের বাটার হ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইংরাজগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উঠে। বেণ্টিঙ্ক ইংরাজগণের অপ্রিয় হইয়া পড়েন। ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদপত্র সকল তাঁহার প্রতি অতি অভদ্র গালাগালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। সে সময়ে অনেকে বেণ্টিঙ্ক মহোদয়কে মুদ্রাযন্ত্রের শাসনের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তদনুসারে কার্য্য করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের ন্যায় বহু-বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যকে সুশাসন করিতে গেলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি স্বাস্থ্যের হানিবশতঃ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিয়া যাইতে পারিলেন না। সে কার্য্যের ভার তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনেরাল লর্ড মেটকাফের জন্য রাখিয়া গেলেন। যে আইনের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীন করা হয়, তাহা লর্ড মেকলে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। লর্ড মেটকাফের প্রশংসার্থ একথা বলা আবশ্যক যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করাতে গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা কঠিন হইবে, ইহা জানিয়াও তিনি ঐ সাহসের কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন; এবং সত্যসত্যই তাহাই তাঁহার উক্ত পদে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া-ছিল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদ আইন ১৮৩৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রণীত হইয়া ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে জারি হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা হইলেই বঙ্গদেশে এক নবযুগের সূত্রপাত হইল। নূতন নূতন সংবাদপত্র সকল দেখা দিতে লাগিল; নবপ্রাপ্ত স্বাধী-নতার ভাব সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের মনে প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তা ও কার্য্যে এক

নূতন তেজস্বিতা প্রবিষ্ট করিল; এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকর কার্য্যের উৎসাহ যেন দশগুণ বাড়িয়া গেল। সেই নব উৎসাহ ও নব উত্তেজনাতে ডিরোজিওর শিষ্যদল নানা বিভাগে নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য যে এই সময়ে জুরি-বিচার প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, মরীশশ দ্বীপের কুলীদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্য ও মফঃস্বল আদালত সকলে ওকালতিতে পারস্যভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত করিবার জন্য, হেয়ার যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন, যুবকদল সে সকল বিষয়ে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ক্রমে আমরা ১৮৪২ সালে উপস্থিত হইতেছি। ঐ সালের প্রারম্ভে সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি পরমানন্দ মৈত্রকে সঙ্গে লইয়া বিলাতযাত্রা করিলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পর দেশের বড়লোকদিগের মধ্যে এই প্রথম বিলাত-যাত্রা। তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর কলিকাতার ভদ্র ও শিক্ষিত হিন্দুসমাজের সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্ববিধ দেশহিতকর কার্য্যে এরূপ মুক্তহস্ত দাতা আর দেখা যায় নাই। ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী স্থাপন, মেডিকেল কালেজ হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যের ন্যায় সাধারণের হিতকর অপরাপর অনুষ্ঠানেও তিনি অকাতরে সহস্র সহস্র মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সদাশয়তার অনেক গল্প দেশে প্রচলিত আছে। সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সদাশয়তার একটী মাত্র নিদর্শন প্রদর্শন করা যাইতেছে। তিনি শৈশবে (Sherburne) শার্বরণ নামক যে ফিরিঙ্গী শিক্ষকের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার বার্দ্ধক্য দশা পর্য্যন্ত চিরদিন তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের সদাশয়তা স্বদেশীয় বিদেশীয় গণনা করিত না; যেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন সেইখানেই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ছিল। এই সদাশয় মুক্তহস্ত পুরুষ যে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? তাঁহার ইংলণ্ড-গমন যে সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা আন্দোলন ও সমালোচনা উত্থিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি এদেশে যেমন সম্মানিত ছিলেন, ইংলণ্ডেও সেইরূপ বহু সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সেখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়া

ও তাঁহার পতি প্রিন্স এলবার্ট, ফ্রান্সের রাজা ও রাণী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বন্ধুতা লাভ করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। বলিতে কি তিনি সর্ব্বত্রই রাজোচিত সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংলণ্ড-যাত্রার পর তৎপরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে রাম গোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি সমবেত হইয়া বেঙ্গল স্পেক্টেটর (Bengal Spectator) নামে এক সংবাদপত্র বাহির করিলেন। এই পত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা দুই ভাষাতে লিখিত হইত এবং প্রথম প্রথম মাসে একবার প্রকাশিত হইত। এই পত্রে নব্য যুবকদল সাধ মিটাইয়া আপনাদের উদার মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। এই পত্র ১৮৪৩ সালে মার্চ্চ মাস হইতে সাপ্তাহিক আকারে পরিণত হয়; পরে নবেম্বর হইতে সাহায্যাভাবে উঠিয়া যায়।

কিন্তু আর এক কারণে এই ১৮৪২ সাল বঙ্গদেশের পক্ষে চিরস্মরণীয় দুর্ব্বৎসর। ঐ বৎসরে মহামতি হেয়ার ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। সেকালের লোকের মুখে যখন তাঁহার মৃত্যুদিনের বিবরণ শ্রবণ করি তখন শরীর কণ্টকিত, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুতে প্লাবিত, এবং হৃদয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রসে আপ্লুত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে হেয়ার সাহেব আপনার ঘড়ির কারবার গ্রে (Grey) নামক তাঁহার এক বন্ধুকে বিক্রয় করিয়া তাঁহারই সঙ্গে বর্ত্তমান কয়লাঘাটের নিকটস্থ এক ভবনে বাস করিতেন। সেখানে ১৮৪২ সালের ৩১ শে মে দিবসে রাত্রি ১টার সময়ে তিনি হঠাৎ দারুণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। তিনি আমরণ কৌমার্য্য ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তাঁহার প্রিয় বেহারা ব্যতীত আর কেহ তাঁহার সঙ্গী ছিল না। দুই একবার দাস্ত ও বমন হওয়াতেই হেয়ার বুঝিলেন যে কালশত্রু তাঁহাকে ধরিয়াছে। নিজের বেহারাকে বলিলেন—"গ্রে সাহেবকে গিয়া আমার জন্য কফিন (শবাধার) আনাইতে বল"। প্রাতঃকালে ডাক্তার ডাকা হইল। তাঁহার প্রিয় ছাত্র মেডিকেল কালেজের উত্তীর্ণ সুযোগ্য ডাক্তার প্রসন্নকুমার মিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং বিধিমতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসা বিদ্যাতে যাহা হয়, ঔষধে যাহা করিতে পারে, বন্ধুজনের যত্ন, আগ্রহ ও চেষ্টাতে যাহা সম্ভব, কিছুই বাকি রহিল না। কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল। তখন ওলাউঠা হইলে সর্ব্বাঙ্গে ব্লিষ্টার লাগাইত। তদনুসারে হেয়ারের গাত্রে ব্লিষ্টার দেওয়া হইয়াছিল। পরদিন অপরাহ্নে তিনি ধীরভাবে প্রসন্ন মিত্রকে বলিলেন—"প্রসন্ন! আর ব্লিষ্টার দিও না; আমাকে শান্তিতে মরিতে দেও"। এই বলিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েক ঘণ্টা শান্তভাবে যাপন করিয়া ১লা জুন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। পরদিন প্রাতে হেয়ার চলিয়া গিয়াছেন এই সংবাদ কলিকাতা সহরে প্রচার হইলে উত্তরবিভাগে ঘরে ঘরে হায় হায় ধ্বনি উঠিল। তিনি যে সকল দরিদ্র পরিবারের পিতা মাতা ছিলেন, সেই সকল পরিবারে হিন্দুরমণীগণ আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তিনি যে সকল দরিদ্র বালককে পালন করিতেন, তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রে সাহেবের ভবনের অভিমুখে ছুটিল। গ্রে সাহেবের ভবনে ছোট বড় বাঙ্গালি ভদ্রলোকে লোকারণ্য! হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় রাধাকান্ত দেব হইতে স্কুলের ছোট ছোট বালক পর্য্যন্ত কেহ আর আসিতে বাকি থাকিল না। কথা উঠিল তাঁহার সমাধি কোথায় হইবে? তিনি খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন না বলিয়া খ্রীষ্টীয় সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার সমাধি লাভ করা কঠিন হইল। অবশেষে তাঁহারই প্রদত্ত, ও হিন্দুকালেজের সংলগ্ন, ভূমিখণ্ডে তাঁহাকে সমাহিত করা স্থির হইল। তাঁহার শব যখন গ্রে সাহেবের ভবন ত্যাগ করিল তখন গাড়ীতে ও পদব্রজে হাজার হাজার লোক সেই শবের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কলিকাতা সেদিন যে দৃশ্য দেখিয়াছিল তাহা আর দেখিবে না! বহুবাজারের চৌরাস্তা হইতে মাধব দত্তের বাজার পর্য্যন্ত সমগ্র রাজপথ জনতার প্লাবনে নিমগ্ন হইয়া গেল। একদিকে সহরের পথে যেমন শোকের বন্যা, অপরদিকে ও তেমনি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মূষলধারে বৃষ্টি ও ঝড় হইতে লাগিল। মনে হইল দেবগণও প্রচুর অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছেন। এইরূপে সুরনরে মিলিয়া হেয়ারের জন্য শোক করিলেন। হেয়ারকে সমাহিত করা হইল; ওদিকে প্রলয় ঝড়ে কলিকাতা সহর কাঁপিয়া গেল।

লাহিড়ী মহাশয় সেদিন প্রাণে কি আঘাত পাইলেন তাহা বলিবার নহে। যে হেয়ার তাঁহার পিতার কাজ করিয়াছিলেন, যে হেয়ার আপদে বিপদে তাঁহার সাহায্যের জন্য মুক্তহস্ত ছিলেন, যে হেয়ার কেবল তাঁহার নহে তাঁহার ভ্রাতাদেরও শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন, যে হেয়ার তিনি পীড়িত হইলে মাতার ন্যায় আসিয়া রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিয়াছেন, সেই হেয়ার চলিয়া গেলেন। আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি এ দারুণ শোক

তাঁহার প্রাণে কিরূপ বাজিল। উত্তরকালে হেয়ারের নাম করিলেই তাঁহার চক্ষু অশ্রুতে সিক্ত হইত। শরীরে যত দিন চলিবার শক্তি ছিল, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, প্রতি বৎসর ১লা জুন হেয়ারের সমাধিক্ষেত্রের নিকটে গিয়া বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া তাঁহার স্মরণার্থ সভা করিয়াছেন। উপকারীর প্রতি কৃত-জ্ঞতা ও সাধু-ভক্তি লাহিড়ী মহাশয়ের চরিত্রের দুইটী প্রধান গুণ ছিল।

কেবল যে রামতনু লাহিড়ী হেয়ারের শোকে শোকার্ত্ত হইলেন তাহা নহে, রামগোপাল প্রমুখ যৌবন-সুহৃদগণও সকলে সেই শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সে সময়ে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বেঙ্গল স্পেক্টেটরের সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহাতে তাঁহারা হেয়ারের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তদনুসারে কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় এক সভা আহ্বান করিলেন। ১৭ই জুন মেডিকেল কালেজে ঐ সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে হেয়ারের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য এক কমিটী নিযুক্ত হইল। রামগোপাল ঘোষ ঐ কমিটীতে ছিলেন। এই কমিটীর চেষ্টাতে হেয়ারের এক সুন্দর শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইল। তাহাই এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কালেজ ও হেয়ার স্কুলের প্রাঙ্গণকে সুশোভিত করিতেছে।

১৮৪২ সালের শেষভাগে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিবার সময় সুপ্রসিদ্ধ জর্জ্জ টমসনকে সঙ্গে করিয়া আসিলেন। ইঁহার মত বাগ্মী ও তেজস্বী লোক অল্পই এদেশে আসিয়াছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে তিনি অগ্নিময় বক্তৃতা করিয়া আপনাকে যশস্বী করিয়াছিলেন। আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মিষ্টর উইলিয়াম এডামের প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সহিত যোগ দেন। সেই সূত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। দ্বারকা নাথ বাবু নিজ সহৃদয়তা ও দেশ-হিতৈষিতা গুণে, এদেশের লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার মানসে, তাঁহাকে এখানে আনয়ন করেন।

জর্জ্জ টমসন এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। যেমন চুম্বকে লোহা লাগিয়া যায়, তেমনি রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রভৃতি জর্জ্জ টমসনের

সহিত মিশিয়া গেলেন। নানা স্থানে নানা সভা সমিতিতে বক্তৃতা হইয়া অবশেষে কলিকাতার ফৌজদারী বালাখানা নামক স্থানে একটী ভবনে টমসনের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। এরূপ বাগ্মিতা এদেশে কেহ কখনও শুনে নাই। সেই সময়ে বালাহিসারে ইংরাজদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীরামপুরস্থ মিশনারি সম্পাদিত ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক একবার লিখিলেন—"এখন দুইদিকে ঘন ঘন কামানের ধ্বনি হইতেছে। পশ্চিমে বালাহিসারে ও পূর্ব্বে ফৌজদারী বালাখানাতে।" বাস্তবিক জর্জ্জ টমসনের বক্তৃতা সামরিক তোপধ্বনির ন্যায় উন্মাদকারিণী ছিল।

জর্জ্জ টমসনের বাগ্মিতার ফলস্বরূপ ১৮৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল দিবসে, ইংলণ্ডের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অনুকরণে কলিকাতাতেও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হইল। শিক্ষিত যুবকদল একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ও তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছিলেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পশ্চাতে পশ্চাতে এই জন্য বলিতেছি যে তাঁহার স্বভাব এই ছিল যে তিনি অধিক কথা কহিতেন না; সর্ব্বদা বিনয়ে মৌনী থাকিতেন; নিজের বয়স্যদিগকে অনেক বিষয়ে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন; এবং সকলের মধ্যে মৌনী থাকিয়া তাঁহাদের কথোপকথনের মধ্যে যাহা ভাল থাকিত তাহাই গ্রহণ করিতেন। তাঁহার বয়স্যগণের মধ্যে যখনি তাঁহাকে দেখি, দেখি তিনি মৌনী ও তিনি সকলের পশ্চাতে। এই স্বভাব-সুলভ বিনয় আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার এই স্বাভাবিক বিনয়ের প্রমাণ স্বরূপ ১৮৩৯ সালে লিখিত রামগোপাল ঘোষের দৈনিক লিপি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"20th Nov. 1839. In the evening Tarachand, Callachand, Peary, Ramtonoo, Ramchunder and Horomohun were here to make arrangements for the conducting of *Gnananweshan*. It appeared from what the two latter said, that it was a losing concern. This they never before gave me to understand, which they should have done before calling the meeting. Every body spoke freely on the subject, *with the exception of Tonoo, who was silent.*"

পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন, কোনও গুরুতর বিষয়ে আলোচনা

করিবার জন্য বয়স্যগণের সম্মিলন হইলেই লাহিড়ী মহাশয় তন্মধ্যে থাকিতেন; তাঁহাকে বাদ দিয়া কোনও কাজ হইত না; কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময় মৌনী থাকিতেন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সভাতে গরম গরম বক্তৃতা করিয়া বয়স্যগণ যখন রামগোপালের ভবনে আসিয়া "ভারতের শুভদিন সন্নিকট" বলিয়া আনন্দ করিতেন এবং শ্যাম্পেনের বোতল খুলিয়া সে আনন্দের উপসংহার করিতেন, তখন লাহিড়ী মহাশয়ও তাঁহাদের সহিত পূর্ণমাত্রায় স্বদেশের নবযুগের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিতেন এবং সেই মহোল্লাসে যোগ দিতেন।

ফৌজদারী বালাখানাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী স্থাপিত হইলে, সেই ভবনে যুবকদলের জ্ঞানার্জ্জন সভাও উঠিয়া আসিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দু-কালেজের অধ্যক্ষ ডি এল, রিচার্ডসন সাহেব দক্ষিণারঞ্জনের এক রাজনীতি সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া এই যুবকদলের চক্রবর্ত্তী ফ্যাকশন নাম দিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সে সময়ে "The Quill" নামে এক কাগজ বাহির করিতেন; তাহাতে রাজনীতি সম্বন্ধে গরম গরম প্রবন্ধ সকল বাহির হইত; এবং তারাচাঁদ ইহাদের দলের একজন অগ্রণী ছিলেন।

অনুমান ১৮০৪ সালে কলিকাতার যোড়াশাঁকো নামক স্থানে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। ইনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। মহাত্মা হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাতে ইঁহার বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেখান হইতে ফ্রী ছাত্ররূপে নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুকালেজে প্রেরিত হন। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তৎপরে অপরাপর কাজ করিয়া শেষে সদর দেওয়ানী আদালতের ডেপুটী রেজিষ্ট্রারের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। সেখান হইতে মুনসেফের পদ প্রাপ্ত হইয়া জাহানাবাদে গমন করেন। কেন যে সে পদে বহুদিন প্রতিষ্ঠিত থাকেন নাই তাহা বলিতে পারি না। কিছুদিন পরে সে কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া তিনি সংস্কৃত মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন; এবং একখানি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ডিক্‌শনারি বাহির করেন। এই সময়েই তিনি "The Quill" নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতেন এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রাজকার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতেন। তাহা গবর্ণমেণ্ট-পক্ষীয় ব্যক্তিগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি যে কেবল জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞান বিস্তারে নিযুক্ত থাকিতেন তাহা

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী।

(১৬৮ পৃষ্ঠা)

B. Kar, Bee Press.

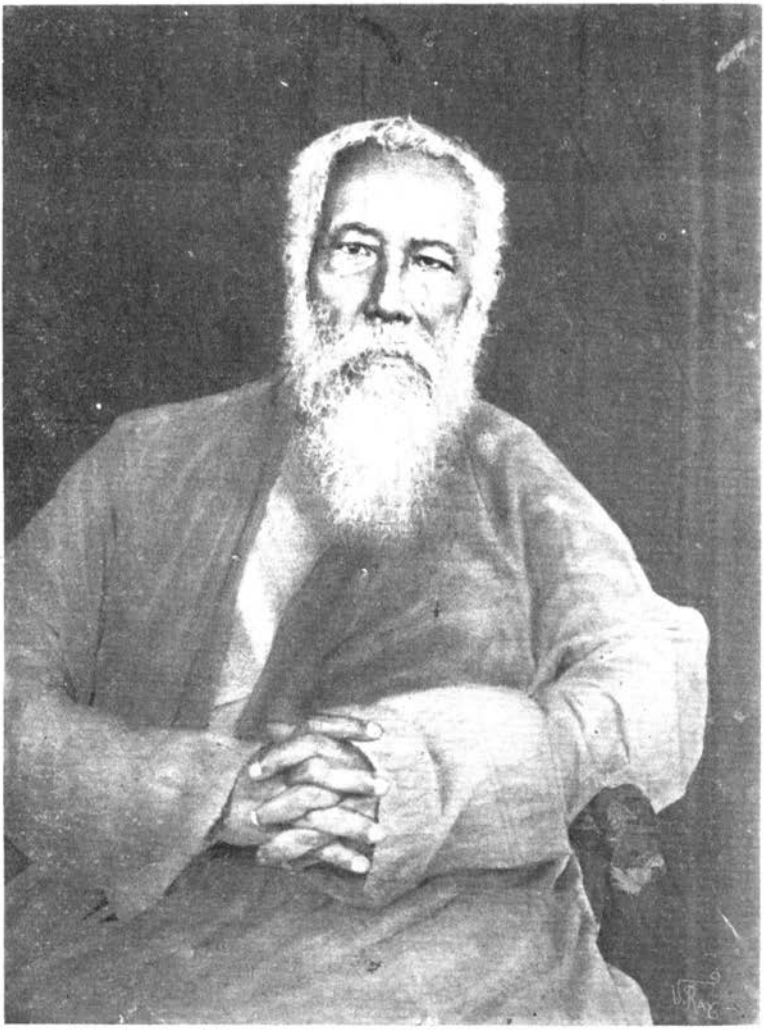

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৯ পৃষ্ঠা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

নহে, দেশহিতকর সর্ব্ববিধ কার্য্যে যুবকবন্ধুগণের সঙ্গী হইতেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন; এবং ১৮২৮ সালে রাজা যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তিনিই তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন।

জীবনের শেষভাগে তিনি বর্দ্ধমান-রাজের ম্যানেজারি কার্য্যে নিযুক্ত হন। শুনিতে পাই বর্দ্ধমানাধিপতি মহতাপ চন্দ বাহাদুর তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন। এই সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে থাকিতে তাঁহার দেহান্ত হয়। ১৮৪৩ সালে যে সকল ব্যক্তি নব্যবঙ্গের নেতৃরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন, তন্মধ্যে ইনি একজন প্রধান।

আর এক কারণে এই ১৮৪৩ সাল বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয়। এই সালে ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে নবজীবন ও নবশক্তি প্রদান করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে;—

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র। অনুমান ১৮১৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। তৎপরে হিন্দুকালেজে আসেন। হিন্দুকালেজে আসিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে পরিগণিত হন। এরূপ বোধ হয় ডিরোজিওর শিষ্যদলের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। যদিও তাঁহার পিতা রামমোহন রায়ের একজন বন্ধু ও রাজার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন, তথাপি গৃহস্থিত প্রাচীন মহিলাগণের শিক্ষার গুণে দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে প্রাচীন ধর্ম্মেই আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়। সে সমুদয় কথার এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিষয় সুখকে হেয়জ্ঞান করিয়া যখন তিনি প্রাচীন বেদান্ত ধর্ম্মের অনুশীলনে যত্নবান হইলেন, তখন, ১৮৩৮ সালে, 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামে এক সভা স্থাপন করিয়া সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে অগ্রসর হইলেন।

দুই তিন বৎসরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। ১৮৪০ সালে তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা নামে একটী বিদ্যালয়

স্থাপন করিলেন। তাহাতে ছাত্রদিগকে রীতিমত বেদান্ত শিক্ষা দেওয়া হইত। তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব এই যে যখন দেশের শিক্ষিত দলের মধ্যে প্রতীচ্যানুরাগ প্রবল, সকলেই পশ্চিমদিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তখন তিনি এদেশের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পত্তির প্রতি মুখ ফিরাইলেন; এবং বেদ বেদান্তের আলোচনার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। তিনি ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু আপনার কার্য্যকে জাতীয়তারূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত রাখিতে ব্যগ্র হইলেন। এই বিশেষত্ব তিনি চিরদিন রক্ষা করিয়াছেন।

একদিকে যখন প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র অনুশীলনের চেষ্টা চলিতে লাগিল, অপরদিকে ১৮৪৩ সালের ৭ই পৌষ দিবসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রায় বিংশতিজন বয়স্যের সহিত প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কল্পে আপনার সমগ্র হৃদয় মন নিয়োগ করিলেন; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল; সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিলেন; এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার লেখক-শ্রেণী-গণ্য হইলেন।

ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৩০ সালে রামমোহন রায় বিলাতযাত্রা করিলে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার প্রধানতঃ ইহার প্রথম আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপরে পতিত হয়। সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অনুরাগের অল্পতা ছিল না; কিন্তু কতিপয় বৎসরের মধ্যেই সমাজের সভ্যগণ অনেকেই ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন কেবল একমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অপর কতিপয় ব্যক্তি বৃদ্ধ আচার্য্যের পৃষ্ঠ-পোষক হইয়া সমাজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এরূপ শুনিতে পাই সমাজের সমগ্র মাসিক ব্যয় একা দ্বারকানাথ ঠাকুর দিতেন। সুতরাং এই ১৮৪৩ সালকেই ব্রাহ্মসমাজের পুনরুত্থানের বৎসর বলিতে হইবে। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা হইতে বাঁশবেড়িয়া গ্রামে উঠিয়া যায়, পরে ১৮৪৬ সালে ইংলণ্ডে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা হইতে তিনি চারিজন ব্রাহ্মণকে চারিবেদ পাঠ করিবার জন্য কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত কারণে তাঁহাদিগকেও ফিরিয়া আসিতে হয়।

১৮৪৪ সালে দুইটী ঘটনা ঘটে। প্রথম, বর্ত্তমান মেটকাফ হলের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে পাবলিক লাইব্রেরী সেই ভবনে উঠিয়া আসে। নব্যবঙ্গের অন্যতম নেতা প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় উহার লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত হওয়াতে লাইব্রেরিটী রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি যুবকদলের একটী সম্মিলন ও জ্ঞানালোচনার ক্ষেত্র হইয়া উঠে। বিশেষতঃ রামগোপাল ঘোষ এই লাইব্রেরীর একজন প্রধান উৎসাহদাতা ও অধ্যক্ষ হন।

দ্বিতীয় ঘটনা, দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয়বার বিলাত গমন। এবার তিনি বিলাত যাত্রার সময় নিজের উদার হৃদয় ও দেশহিতৈষিতার অনুরূপ একটী সৎকার্য্য করেন। কলিকাতা মেডিকেল কালেজ স্থাপনে তিনি যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। উক্ত কালেজের বর্ত্তমান হাঁসপাতালটী নির্ম্মাণের জন্য অনেক টাকা দিয়াছিলেন, তাহার ও উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা বা দানশক্তি তাহাতেও পর্য্যবসিত হয় নাই। ১৮৪৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড-যাত্রার অভিপ্রায় করিলেন; সেই সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প করিলেন যে নিজের ব্যয়ে মেডিকেল কালেজের কয়েকজন ছাত্রকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া শিক্ষিত করিয়া আনিবেন। তদনুসারে এডুকেশন কাউন্সিলের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। উক্ত কাউন্সিলের চেষ্টাতে চারিজন ছাত্র জুটিল। তন্মধ্যে শ্রীমান্ ভোলানাথ বসু ও শ্রীমান্ সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তীর ব্যয় তিনি দিলেন; এবং শ্রীমান্ দ্বারকানাথ বসু ও শ্রীমান্ গোপাল লাল শীলের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট দিলেন। এই চারিজন ছাত্র ডাক্তার এডোয়ার্ড গুডিভের তত্ত্বাবধানে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে গমন করেন। দুঃখের বিষয় এই বিলাত যাত্রাই দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের শেষ যাত্রা হইল। সেখানে ১৮৪৬ সালে তাঁহার দেহান্ত হয়; এবং তাঁহার দেহ লণ্ডন সহরের এক সুপ্রসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত রহিয়াছে।

এদিকে এই সময়ে দেশের শিক্ষিত সমাজের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। ডিরোজিও যে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন তাহা এই সময়ে বঙ্গসমাজে পূর্ণামাত্রায় কাজ করিতেছিল। শিক্ষিতদলের মধ্যে সুরাপানটা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুকালেজের ষোল সতের বৎসরের বালকেরা সুরাপান করাকে শ্লাঘার বিষয় মনে করিত। বঙ্গের অমর

কবি মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি এই সময়ে হিন্দুকালেজে পাঠ করিতেছিলেন। সে সময়কার লোকের মুখে শুনিয়াছি যে কালেজের বালকেরা গোলদিঘীর মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া মাধবদত্তের বাজারের নিকটস্থ মুসলমান দোকানদারের দোকান হইতে কাবাব মাংস কিনিয়া আনিয়া দশজনে মিলিয়া আহার করিত ও সুরাপান করিত। যে যত অসমসাহসিকতা দেখাইতে পারিত তাহার তত বাহাদুরি হইত, সেই তত সংস্কারক বলিয়া পরিগণিত হইত!

একদিকে যুবক বয়স্যদিগের মধ্যে এইরূপে দেশীয় রীতিবিরুদ্ধ আচরণ ওদিকে কালেজ গৃহে ডি এল রিচার্ডসন সাহেবের সেক্সপীয়ার পাঠ। এরূপ সেক্সপীয়ার পড়িতে কাহাকেও শোনা যায় নাই। তিনি সেক্সপীয়ার পড়িতে পড়িতে নিজে উন্মত্তপ্রায় হইয়া যাইতেন, এবং ছাত্রগণকেও মাতাইয়া তুলিতেন। তিনি যে অনেক পরিমাণে মধুসূদনের কবিত্ব শক্তি স্ফুরণের কারণ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মুখে সেক্সপীয়ার শুনিয়া ছাত্রগণ সেক্সপীয়ারের ন্যায় কবি নাই, ইংরাজী সাহিত্যের ন্যায় সাহিত্য নাই, এই জ্ঞানেই বর্দ্ধিত হইত। দেশের কোনও বিষয়ের প্রতি আর দৃক্‌পাত করিত না। স্বজাতি-বিদ্বেষ অনেক বালকের মনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাবাপন্ন ছাত্রগণের মধ্যে সুরাপান অবাধে চলিত। অতিরিক্ত সুরাপান বশতঃ অনেক শিক্ষিত যুবকের শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, এবং অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

সময় বুঝিয়া এই সময়ে সুবাগ্মী খ্রীষ্টীয় প্রচারক ডফ তাঁহার মধ্য বয়সের অদম্য উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতেছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্য ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃদ মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করার পর দেশমধ্যে যে আন্দোলন উঠিয়াছিল বলিতে গেলে তাহা আর থামে নাই। এই সময়ে বা ইহার কয়েক বৎসর পরে পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। এতদ্ব্যতীত গুরুদাস মৈত্র প্রভৃতি আরও কয়েকজন ভদ্রঘরের ছেলে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন। তন্মধ্যে ১৮৪৫ সালে একজনকে লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঠাকুর বাবুদের দেওয়ানের পুত্র উমেশচন্দ্র সরকার খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের

আশ্রয়ে সস্ত্রীক পলাইয়া মিশনারিদিগের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাকে মিশনারিদিগের হাত হইতে ছিঁড়িয়া লইবার জন্য তাহার পিতা বিস্তর চেষ্টা করেন। ডফ সাহেব সে পথে অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান হন। ইহা লইয়া হিন্দু-সমাজ মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণও এই আবর্ত্তে পড়িয়া খ্রীষ্টীয়-বিরোধী-দলের অগ্রণী হইয়া দাঁড়ান। কলিকাতার ভদ্র গৃহস্থগণ এক মহাসভা করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করেন। হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; এবং কিছুদিন মহা উৎসাহে তাহার কাজ চলিতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য সংগৃহীত টাকা যাঁহাদের হস্তে গচ্ছিত ছিল, তাঁহাদের কারবারে ক্ষতি হওয়াতে ঐ সমুদয় টাকা নষ্ট হয়, তাহাতেই কয়েক বৎসর পরে ঐ বিদ্যালয় উঠিয়া যায়।

একদিকে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের প্রতি গোলাগুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। খ্রীষ্টানগণও ব্রহ্মসমাজের ধর্ম্ম বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন বলিয়া আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তত্ত্ববোধিনী আপনার অবলম্বিত ধর্ম্মকে বেদান্তধর্ম্ম ও বেদকে তাহার অভ্রান্ত ভিত্তি বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা হইতে 'বেদ অভ্রান্ত ঈশ্বর-দত্ত গ্রন্থ হইতে পারে কি না?' এই বিচার ব্রাহ্মসমাজের ভিতর ও বাহিরে উপস্থিত হইল। ভিতরে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ইহার প্রতিবাদ উপস্থিত করিলেন; এবং বাহির হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মদিগকে কপট ও ভণ্ড বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

এই সকল সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবারে কয়েকটী ঘটনা ঘটে। প্রথম, লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্রের মৃত্যু। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধাবিলাস তাঁহার অগ্রেই গিয়াছিলেন, তৎপরে যখন কেশবের যাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন কৃষ্ণনগরের লোক সাধু পিতা রামকৃষ্ণের ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। এরূপ শুনিতে পাই, কেশব-চন্দ্রকে সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করান হইয়াছিল। যখন তাঁহাকে গঙ্গাতে লইয়া যাওয়া হয়, কেশবচন্দ্র পিতার পদধূলি-প্রার্থী হইলেন। তদনুসারে রামকৃষ্ণ ধীর গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইয়া পুত্রের মস্তকে নিজের পদধূলি দিয়া বিদায় করি-

লেন। সেই সাধুর মুখে কোনও শোক বা বিকারের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগের পরেই সমুদয় সংসারের ভার কনিষ্ঠভ্রাতা রামতনুর স্কন্ধে পড়িয়া গেল। তিনি যথা-সাধ্য সে ভার বহন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়, এই ঘটনার অল্পকাল পরেই বোধ হয় তাঁহার তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ হয়। তিনি যখন হিন্দুকালেজের তৃতীয় কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন কাঁদবিলা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত তাঁহার প্রথম পরিণয় হয়। ঐ পত্নী চারি পাঁচ বৎসরের অধিক জীবিত ছিলেন না। তৎপরে পাবনার অন্তর্গত মথুরা নামক গ্রামের এক ব্রাহ্মণের কন্যাকে পুনরায় বিবাহ করেন। এরূপ শুনা যায়, এই বিবাহে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। কি কারণে জানি না, বোধ হয় তিনি ডিরোজিওর শিষ্যদলের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন বলিয়াই হইবে, তাঁহার দ্বিতীয় শ্বশুর স্বীয় কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিতে চাহিতেন না। ইহা লইয়া দুই পরিবারে মনান্তর ঘটে; এবং সে কারণে লাহিড়ী মহাশয়কে মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। বোধ হয় এই পত্নীকেই লক্ষ্য করিয়া রামগোপাল ঘোষ তাঁহার দৈনিক লিপিতে এক স্থানে লিখিতেছেন :—

April 4th, 1839—But our conversation did not thicken till we touched the subject of women—bright women! We spoke of the peculiarites of each other's wives. * * * Poor Ramtonoo appeared to be worried by his wife. But I should not indulge myself in writing the secrets of my friends in this book."

ঘোষজ মহাশয় আপনার ভদ্রতার দ্বারা আপনাকে বাধা না দিলে, বোধ হয় লাহিড়ী মহাশয়ের মানসিক অশান্তির সমগ্র কারণটা ব্যক্ত হইয়া পড়িত।

যাহা হউক দ্বিতীয় বিবাহ লাহিড়ী মহাশয়ের সুখের কারণ হয় নাই। আর সে পত্নীকেও শ্বশুর ঘরে আসিতে হয় নাই। তিন চারি বৎসরের মধ্যে তিনিও গত হন। তৎপরে এই সময়ে কি ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হাবড়ার সন্নিহিত সাঁতরাগাছি গ্রামের স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার তৃতীয়বার পরিণয় হয়। ইনিই তাঁহার সন্তানগণের জননী।

তৃতীয়, তাঁহার আরাধ্যা জননীদেবী এই সময়ে কঠিন পীড়াতে আক্রান্ত হন। কৃষ্ণনগরে রাখিলে তাঁহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইবার আশা না দেখিয়া তাঁহাকে কলিকাতাতে আনা হয়। যে মাতাকে কেশবচন্দ্র পুষ্প চন্দন দ্বারা পূজা

করিতেন, যাঁহাকে প্রতিবেশিগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, যিনি নিতান্ত দারিদ্র্যে বাস করিয়াও অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পিতৃকুলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, যিনি সততা, তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন, সেই জননীর সেবা তাঁহার পুত্রগণ কিরূপে করিয়াছিলেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। লাহিড়ী মহাশয় এ সময়ে যেরূপ মাতৃসেবা করিয়াছিলেন সেরূপ মাতৃসেবা কেহ কখনও দেখে নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তখন বালিকা, কিন্তু ঐ মাতৃসেবার কথা চিরদিন তাহার স্মৃতিতে মুদ্রিত ছিল। চিরদিন পুলকিতচিত্তে নিজের সন্তানগণের নিকট সেই মাতৃসেবার বিষয় বর্ণন করিতেন।

জননী কলিকাতায় আসা অবধি লাহিড়ী মহাশয়ের আহার নিদ্রা রহিত হইয়াছিল। কোনও প্রকারে স্কুলে গিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া দিন রাত্রি মায়ের পার্শ্বে যাপন করিতেন; ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার আদেশ পালন করিতেন; পুত্রের ন্যায় তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন; মেথরের ন্যায় তাঁহার মলমূত্র দক্ষিণ হস্তে পরিষ্কার করিতেন; এবং কন্যার ন্যায় তাঁহার রোগশয্যাকে আরামের স্থান করিবার প্রয়াস পাইতেন। দুঃখের বিষয় জননী আর সে পীড়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। সেই রোগে কলিকাতা সহরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

তৎপরে ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে কৃষ্ণনগর কালেজ খোলা হইলে লাহিড়ী মহাশয় তাহার স্কুল ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া গমন করিলেন। তাঁহার কৃষ্ণনগর গমন স্থির হইলে, তাঁহার যৌবন-সুহৃদগণ আপনাদের মধ্য হইতে চাঁদা করিয়া নিজেদের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে একটী ঘড়ি উপহার দিলেন। যে কয়জন বন্ধুর প্রতি ঐ ঘড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিবার ভার ছিল, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় ঐ ঘড়িটী মহামূল্য সম্পত্তি জ্ঞানে চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন।

১৮৪৬—১৮৫৩ পর্য্যন্ত।

১৮৪৬ সালের ১লা জানুয়ারি মহাসমারোহ সহকারে কৃষ্ণনগর কালেজ খোলা হইল। কৃষ্ণনগরের পক্ষে সে দিন এক স্মরণীয় দিন। সে সময়ে শ্রীশচন্দ্র নদীয়ার রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই নব-প্রতিষ্ঠিত কালেজের উৎসাহদাতা হইলেন। তৎপূর্ব্বে নদীয়ার রাজবংশের কোনও সন্তান সাধারণের সহিত এক সঙ্গে শিক্ষালাভ করে নাই। রাজারা নানা স্থান হইতে সুযোগ্য ওস্তাদ আনাইয়া স্বীয় পরিবারের বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। শ্রীশচন্দ্র সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া স্বীয় পুত্র সতীশচন্দ্রকে কালেজে পড়িতে দিবার সংকল্প করিলেন; এবং নিজে কালেজ কমিটীর একজন সভ্য হইলেন। কেবল যে নামমাত্র সভ্য হইলেন তাহা নহে, কমিটীর প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব কালেজের প্রথম অধ্যক্ষ হইয়া গমন করিলেন; এবং লাহিড়ী মহাশয় এক শত টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া গেলেন। সে সময়ে যাঁহারা কৃষ্ণনগর কালেজে লাহিড়ী মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন, তাঁহাদের মুখে যখন তাঁহার তৎকালীন উৎসাহ ও অনুরাগের কথা শুনি তখন চমৎকৃত হইয়া যাই। তিনি যখন পড়াইতে বসিতেন তখন দেখিলে বোধ হইত যেন পৃথিবীতে তাঁহার করিবার বা ভাবিবার অন্য কিছু নাই। সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ তাহাতে ঢালিয়া দিতেন। তিনি স্বীয় কার্য্যে এমনি তন্ময় হইয়া যাইতেন যে এক এক দিন কালেজের অধ্যক্ষ বা হেড মাষ্টার তাঁহাকে কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া তাঁহার পড়ান শুনিতেন; একটু অবসর পাইলে কথা কহিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার পাঠনার রীতি এই ছিল যে কোনও পাঠ্য বিষয়ের প্রসঙ্গে কোনও জ্ঞানের কথা পাইলে তিনি সে সম্বন্ধে

বালকদিগের জ্ঞাতব্য যাহা কিছু আছে তাহা সমগ্রভাবে না বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। পড়াইতে পড়াইতে যদি আরবের নাম কোথাও পাইলেন তাহা হইলে আরবের প্রাকৃতিক অবস্থা, তাহার অধিবাসীদের স্বভাব ও প্রকৃতি, মহম্মদের জন্ম ও ধর্ম্ম প্রচারের বিবরণ প্রভৃতি বালকদিগকে না জানাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। এইরূপ অধ্যাপনায় পাঠ্যগ্রন্থগুলি পাঠের বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইত না বটে, কিন্তু বালকেরা যথার্থ জ্ঞান লাভ করিত; এবং তাহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসার বিষয় এই যে ইহা তাহাদের অন্তরে জ্ঞানানুরাগ উদ্দীপ্ত করিত। কেবল তাহা নহে তিনি কালেজের ছুটীর পর ডিরোজিওর ন্যায় বালকদিগের সহিত কথা-বার্ত্তাতে অনেকক্ষণ যাপন করিতেন। অনেক সময়ে কালেজের মাঠে তাহাদের সঙ্গে খেলিতেন। এইভাবে তাঁহার কৃষ্ণনগরের শিক্ষকতা কার্য্য আরম্ভ হইল।

এই সময়ে দুই দিক হইতে দুই স্রোত আসিয়া ক্ষুদ্র কৃষ্ণনগর সমাজে মহা তরঙ্গ উত্থিত করিল। তাহার বিবরণ ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিত হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"১২৪৩ কি ৪৪ বাং অব্দে কৃষ্ণনগরনিবাসী দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী (রামতনু বাবুর কনিষ্ঠ) নিজ নিকেতনে এক অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। * * * তৎকালে শ্রীপ্রসাদের স্বদেশীয় প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল, সুতরাং তিনি প্রথমে এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোনও উপদেশ দিতেন না। কিয়ৎকালানন্তর তিনি ও তাঁহার সমবয়স্ক দুই তিন জন ছাত্র স্বদেশের ধর্ম্ম ও রীতি-নীতির গুণাগুণের বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন; এবং ক্রমশঃ সাকার উপাসনার অলীকতা ও প্রচলিত আচার ব্যবহারের দোষ গুণ বুঝিতে পারেন। তিনি পূর্ব্বে ছাত্রগণের মনোবৃত্তির উন্নতিসাধনে যেমন যত্ন করিতেন, ইদানীং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সম্পন্ন করণেও তেমনি যত্নবান হইলেন।"

"কিছুদিন পরে তাঁহার মতাবলম্বী ছাত্রগণ আপন আপন প্রতিবেশী ও আত্মীয়গণের কুসংস্কার দূরীভূত করিতে প্রগাঢ় যত্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সোণাডেঙ্গানিবাসী, অধুনা কৃষ্ণনগরবাসী, শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় এই নগরস্থ মিশনারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। মিশনারিরা তাঁহাকে খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বী করিতে বহু প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু

সফল-প্রযত্ন হইতে পারেন নাই। তিনি এক-ব্রহ্ম-বাদী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। তিনিও শ্রীপ্রসাদের অনুকরণ করিয়া আপনার ছাত্র ও বান্ধবদিগের দূষিত সংস্কার সকল দূরীভূত করণে প্রবৃত্ত হন; এইরূপে কৃষ্ণনগরে প্রচলিত ধর্ম্মের বিপ্লব ঘটিয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে নগরের অনেক যুবা এই অভিনব মতের অনুরাগী হইলেন। যদিও তাঁহাদের বাহ্যিক ভাবের বড় বৈলক্ষণ্য হইল না, কিন্তু আন্তরিক ভাবের প্রভূত পরিবর্ত্তন হইল। নূতন সম্প্রদায়ের আন্তরিক ভাব যে এককালে সাধারণের অগোচর ছিল এমনও নহে, নগরের অনেক প্রধান বংশোদ্ভূত যুবকগণ ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন এবং রাজা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও আদর করিতেন এই বলিয়া কোনও গোলযোগ উপস্থিত হইত না।"

শ্রীশচন্দ্র কেবল পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসংস্কারার্থী যুবকদলকে আদর শ্রদ্ধা করিতেন তাহা নহে, তিনি নিজে রাজবাটীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিতকার আর এক স্থানে লিখিতেছেন:—

"তিনি (শ্রীশচন্দ্র) ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে এ প্রদেশস্থ তিন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের স্থাপিত কলিকাতার তদানীন্তন ব্রাহ্ম সমাজের প্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের নিয়ম-পত্রে তাহাদের স্বাক্ষর করাইলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার করণার্থ একজন বেদবিৎ উপদেষ্টাকে পাঠাইতে তৎকালীন উক্ত-সমাজাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে পত্র লিখিলেন। তিনি সহসা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত না পাইয়া হাজারি লাল নামে একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারককে পাঠাইয়া দিলেন। হাজারি একে শূদ্রজাতি তাহাতে আবার বেদবেত্তা ছিলেন না, একারণ রাজা নিজে সাতিশয় ক্ষুণ্ণমনা হইলেন। তৎকালে রাজার নিকট ভাটপাড়া-নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন; তিনি বেদান্ত ও ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন কিন্তু লোকনিন্দা-ভয়ে প্রকাশ্যরূপে বেদান্ত-ধর্ম্ম প্রচারে সম্মত ছিলেন না; সুতরাং রাজা হাজারিকে তৎক্ষণাৎ বিদায় না করিয়া রাজবাটীতে তাহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

"দুই তিন দিবস পরে রাজা কোনও প্রয়োজনানুরোধে মুরশিদাবাদে

গমন করিলেন; এবং হাজারি ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। রাজা মাসাবধি মুরশিদাবাদে অবস্থান করেন; এইকাল মধ্যে কৃষ্ণনগরে প্রায় চল্লিশ জন যুবা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; এবং জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে দুই বুধবারে সকলে একত্রিত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিলেন। রাজা শূদ্রজাতীয় হাজারি সমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং বাটী প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মদিগকে রাজবাটীতে সমাজ করিতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মগণ আমিনবাজারে একটী ক্ষুদ্র বাটী ভাড়া করিয়া তন্মধ্যে সমাজ সংস্থাপন করিলেন; এবং আপাততঃ ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অল্পদিন মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ উপাচার্য্য প্রেরণ করিলেন।

"ব্রাহ্মগণের শ্রেণী যেমন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, নগরমধ্যে এ বিষয়ের আন্দোলন তেমনি বাড়িয়া উঠিল। তাঁহারা বারনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায়কে সহায় করিয়া গোয়াড়িতে এক ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন; এবং ব্রাহ্মদিগের অনিষ্টসাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। কিন্তু মহারাজা ব্রাহ্মগণের স্বপক্ষ থাকাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত অবনতি হইল না। কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে ও ব্রাহ্মগণের প্রযত্নে ১৭৬৯ শকে (১৮৪৭ খৃঃ অব্দে) বর্ত্তমান সমাজ-মন্দির নির্ম্মিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গৃহ নির্ম্মাণার্থ এক সহস্র টাকা দান করেন।"

পাঠকগণ দেখিতেছেন কলিকাতার অনুকরণে কৃষ্ণনগরে যে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন উঠিয়াছিল তাহা নহে, ধর্ম্মসভাও স্থাপিত হইয়াছিল; এবং প্রধান প্রধান ধনিগণ তাহার সারথি-স্বরূপ হইয়া নব্যদলের শাসনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এই উভয়দলের মধ্যে দণ্ডায়মান; সমগ্র হিন্দুসমাজ এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার পশ্চাতে, সুতরাং তিনি পূর্ণমাত্রায় নবোত্থিত বেদান্তধর্ম্মের মুখপাত্র হইতে পারিলেন না; কিন্তু উৎসাহ-দান, অনুরাগ, আদর, শ্রদ্ধা প্রভৃতির দ্বারা যতদূর হয় করিতে লাগিলেন। কেবল তাহা নহে, তিনি নবদ্বীপ হইতে বড় বড় পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া তাঁহাদের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন—"কেন আপনারা বেদ-বিহিত বেদান্ত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন না?" ফল কি হইল তাহা উক্ত গ্রন্থকার সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন;—

"বুদ্ধিমান ও বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা সরলচিত্ত তাঁহারা মহারাজের অভিপ্রায় শাস্ত্রসম্মত ও সর্ব্বজন-হিতকর বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু দেশাচার ভয়ে জনসমাজে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে বা তদনুযায়ী ব্যবস্থা দিতে সাহস করিতে পারিলেন না।"

অনেকে হয় ত স্বভাবতঃ মনে করিবেন যে লাহিড়ী মহাশয় কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করিয়াই ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বেদান্তধর্ম্মাবলম্বী সংস্কারকদলের অগ্রণী হইলেন। কিন্তু তাহা নহে। ১৮৪৫ সালে, উমেশচন্দ্র সরকারের আন্দোলন উঠিলে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ একদিকে আপনার ধর্ম্মকে বেদান্তধর্ম্ম ও বেদকে অভ্রান্ত ঈশ্বর-বাণী বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, এবং অপর দিকে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উভয় কার্য্য-নীতিই সত্যানুরাগী ডিরোজিও-শিষ্যদলের চক্ষে নিন্দনীয় বোধ হইয়াছিল। লাহিড়ী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণের মুখে বেদের অভ্রান্ততাবাদ কপটতা বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন; এবং খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের নিন্দা অনুদারতা বলিয়া প্রতীতি করিলেন; সুতরাং তিনি বেদান্তধর্ম্মীদিগের সহিত সংযুক্ত হইলেন না। সংযুক্ত হওয়া দূরে থাক্ তাঁহাদের পত্রিকা "তত্ত্ববোধিনী" লইতেও স্বীকৃত হইলেন না; এবং তাঁহাদের মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিলেন না। কেন তিনি ইঁহাদের প্রতি চটিয়াছিলেন তাহার কারণ উক্ত সময়ে ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিত পত্রের নিম্নলিখিত অংশ হইতে জানা যাইবে।

১৮৪৬ সালের ২৪ জুলাই কৃষ্ণনগর হইতে তিনি কলিকাতাতে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে পত্র লিখিতেছেন। রাজনারায়ণ বাবু তখন হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ বর্ষের প্রারম্ভে ব্রাহ্মধর্ম্মে বা তদানীন্তন বেদান্তধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে গতায়াত করিতেছেন; এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ কার্য্যে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সহকারী হইবেন, এইরূপ প্রস্তাব চলিতেছে। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও শিষ্যদলের সহিত পূর্ব্ব হইতেই যে রাজনারায়ণ বাবুর আলাপ পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই পত্রে পাওয়া যাইতেছে।

MY DEAR RAJNARAIN,

I cannot think much of the Vedantic movements here or elsewhere. The followers of Vedanta temporize. They do not

believe that the religion is from God, but will not say so to their countrymen, who believe otherwise. Now, in my humble opinion, we should never preach doctrines as true, in which we have no faith ourselves. I know that the subversion of idolatry is a consummation devoutly to be wished for, but I do not desire it by employing wrong means. I do not allow the principle that means justify the end. Let us follow the right path assured that it will ultimately promote the welfare of mankind. It can never do otherwise.

I wish to request the Secretary of the *Tuttobodhini Sabha* to discontinue sending me the Society's paper (Patrika), as a person cannot subscribe to it who is not a member of the Society. * * * I fear also that there is a spirit of hostility entertained by the Society against Christianity which is not creditable. Our desire should be to see truth triumph. Let the votaries of all religions appeal to the reason of their fellow-creatures and let him who has truth on his side prevail."

যে সরল সত্য-প্রিয়তার ও উদারতার নিদর্শন লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনে আমরা উত্তরকালে দেখিয়াছি, তাহা এই যৌবনের প্রথমোদ্যমেও দেখিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের লোক যতদিন মুখে বলিয়া কার্য্যে তাহা না করিতেন, ততদিন তিনি ইহার সঙ্গে যোগ দেন নাই,—উৎসাহ দিতেন, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত একীভূত হইতেন না। পরে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল দেখা দিলে তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় নবোদিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত যোগ দিলেন না বটে কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবে ও তাঁহার সংশ্রবে কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক নবভাবের অবির্ভাব হইল। তিনি শিক্ষাগুরু ডিরোজিওর নিকটে যে যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী প্রধান মন্ত্র এই ছিল যে, মানবের চিন্তা ও কার্য্যকে স্বাধীন রাখিতে হইবে। হিন্দু কালেজ কমিটী কালেজের ছাত্রদিগকে ডফ্ ও ডিএলটির বক্তৃতা শুনিতে যাইতে নিষেধ করিলে ডিরোজিও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই ভাব

তাঁহার শিষ্যদলের মনে চিরদিন পূর্ণমাত্রায় কার্য্য করিয়াছে। তাঁহারা চিরদিন মানবের স্বাধীনতাকে পবিত্র পদার্থ মনে করিয়া আসিয়াছেন; কোনও কারণেই তাহাতে হস্তার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবনের পূর্ণ উৎসাহের মধ্যে সেই ভাব পূর্ণমাত্রায় কার্য্য করিতেছিল। তিনি শিক্ষকরূপে বালকদিগের মধ্যে বসিতেন বটে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহাদের সহিত বয়স্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। স্বীয় গুরু ডিরোজিওর ন্যায় কোনও একটা বিষয়ে তর্ক তুলিয়া স্বাধীন ও অসংকুচিত ভাবে তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে দিতেন। নিজে পূর্ব্বপক্ষ লইয়া তাহাদিগকে উত্তরপক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন। কেবল যে মানবের চিন্তার স্বাধীনতাকে আদর করিতেন বলিয়া এইরূপ করিতেন, তাহা নহে, চিরজীবন তাঁহার এপ্রকার বাল-সুলভ বিনয় ছিল যে, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি মনে করিতেন বালকের নিকটেও কিছু শিখিবার আছে। আমরা বয়সে তাঁহার পুত্রের সমান, অথচ অনেক সময় আমাদের একটী সামান্য মত বা উক্তি এরূপ সম্ভ্রমের সহিত শুনিতেন যে আমাদের কথা কহিতে লজ্জা হইত। পূর্ব্বপুরুষগণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, "বালাদপি সুভাষিতং গ্রাহ্যং" ভাল কথা বালকের মুখ হইতেও শুনিতে হইবে। লাহিড়ী মহাশয় কাজে তাহাই করিতেন। কোনও একটা প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া কোন্ বালক কি বলে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন; এবং কাহারও মুখে কোনও একটা ভাল কথা শুনিলে আনন্দিত হইয়া উঠিতেন। "একথা তুমি কোথায় পাইলে? এরূপ কথা তোমাকে কে শুনাইল!" বলিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেন। যদি শুনিতেন যে সে নিজগৃহে গুরুজনের মুখে শুনিয়াছে, অমনি বলিতেন "হবে না, কিরূপ বংশের ছেলে।" চিরদিন বংশ-মর্য্যাদার প্রতি তাঁহর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাহা হউক এইরূপ স্বাধীন বিচারের ভাব প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক নবভাব দেখা দিল। তাহারা স্বাধীন ভাবে সমুদয় সামাজিক বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইল।

এই সময়ে কিছুদিন ধরিয়া কৃষ্ণনগরে একটা বিষয়ের বিচার চলিতেছিল—তাহা বিধবা-বিবাহ। অনেকের সংস্কার আছে, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্ব-প্রথমে বঙ্গসমাজে বিধবা-বিবাহের বিচার উপস্থিত করেন। কিন্তু বোধ হয় তাহা ঠিক নহে। ১৮৪২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও-

শিষ্যগণ যে "বেঙ্গল স্পেক্টেটার" নামক কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে তাঁহারা বিধবা-বিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার উপস্থিত করেন। কয়েক মাস ধরিয়া ঐ পত্রে উক্ত বিচার চলিয়াছিল। এমন কি "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি যে পরাশর বচনের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বপ্রথমে উক্ত পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধৃত করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই পণ্ডিতদ্বয় পশ্চাতে থাকিয়া ঐ সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া লেখকদিগের হস্তে দিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। তাহার কোনও প্রকাশ নাই। তবে উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের সহিত নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দের যে বিশেষ আত্মীয়তা ছিল, তাহা জ্ঞাত আছি। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি জীবনচরিত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেখিতেছি যে ১৮৪৩ সালে একবার রামগোপাল ঘোষ মহাশয় স্বীয় "লোটাস" নামক জাহাজে করিয়া কতিপয় বন্ধুসহ গঙ্গা পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু ও পণ্ডিতবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার সেই কতিপয় বন্ধুর মধ্যে ছিলেন। অতএব বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বচন উদ্ধৃত করিয়া বেঙ্গল স্পেক্টেটারের লেখকগণের সাহায্য করা পণ্ডিতদ্বয়ের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে।

তবেই দেখা যাইতেছে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তিত করা যে কর্ত্তব্য এই বিশ্বাস ১৮৪৩ সাল হইতে চক্রবর্ত্তী ফ্যাকশনের সভ্যগণের সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাঁহারা দশজনে একত্র হইলেই সে বিষয়ে আলোচনা করিতেন, উৎসাহের সহিত সেই মত প্রচার করিতেন, চারিদিকে তাহা লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেন। ক্রমে এই মত কৃষ্ণনগরেও যায়।

রাজা শ্রীশচন্দ্র নিজে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। এরূপ আশা হইয়াছিল যে পণ্ডিতগণকে লওয়াইয়া তিনি কাজে কিছু করিলেও করিতে পারেন। যে কারণে তিনি সে বিষয়ে নিরুদ্যম হন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতকার মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের কার্য্যকলাপের উল্লেখ করিতে গিয়া বলিতেছেন :—

"রাজা বেদানুমোদিত পরব্রহ্মের আরাধনা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বিধবা কামিনীদিগের অবস্থা একদিনের

নিমিত্তও বিস্মৃত হন নাই। তিনি এই স্থির করিয়াছিলেন যে, এপ্রদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করা শাস্ত্রের সহায়তায় যতদূর হইবেক, কেবল যুক্তি অবলম্বন করিলে ততদূর হইবেক না; একারণ, যদ্যপিও এদেশস্থ পণ্ডিতগণ বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত স্বীকার করিয়াও তাহার ব্যবস্থা দিতে অসম্মত হন, তথাপি রাজা এই ব্যবস্থা পাইবার নিমিত্ত বিবিধ কৌশল অবলম্বন করেন। অবশেষে নবদ্বীপস্থ কয়েকজন পণ্ডিত পুরস্কার লাভাশয়ে ব্যবস্থা দিতে সম্মত হন। ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময়ে, নগরস্থ নব্যসম্প্রদায় সহসা এখানকার কালেজগৃহে এক সভা করিয়া স্বদেশের প্রচলিত রীতি নীতির বহুবিধ নিন্দাবাদ করণান্তর বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বিরুদ্ধ-বাদিগণ, নবমতাবলম্বীরা কালেজে একত্র হইয়া স্বহস্তে গোহত্যা করিয়া, তাহার মাংস ভোজন ও মদিরা পান করিয়াছেন, এইরূপ অপবাদ সর্ব্বত্র রটনা করিয়া দিলেন। এই অমূলক কথা দূর ও অদূরবর্ত্তী নানা স্থানে আন্দোলিত হইতে লাগিল। প্রথমে বীরনগরবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যায় আপন স্বসম্পর্কীয় বালকগণের কালেজে যাওয়া রহিত করিলেন; এবং দুই তিন দিনের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুগামী হইলেন। কালেজে এরূপ সভা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া, কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক কালেজের অধ্যক্ষ তিরস্কৃত হইলেন। মহারাজ, যাহাতে কালেজের হানি না হয়, তদ্বিষয়ে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই উপরোক্ত জনরবের মূল বৃত্তান্ত প্রচারিত হইল, এবং যে সকল বালক কালেজ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা পুনরায় কালেজে প্রবেশ করিল, কিন্তু নগর মধ্যে এক বিষম দলাদলি হইয়া উঠিল। যাহা হউক, মহারাজার আনুকূল্য প্রযুক্ত নবাদল সবল থাকিল, এবং দুই তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত গোল তিরোহিত হইল। রাজা যে ব্যবস্থা লইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহা এই গোলযোগে বিফল হইয়া গেল"।

ঐ কালেজগৃহের সভার পূর্ব্বে আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যদলের ঐ গোথাদক অপবাদ প্রবল হয়। সে ঘটনাটীর বিবরণ দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়ের লিখিত আত্মজীবন-চরিত হইতে উদ্ধৃত হইতেছে:—

"কলিকাতা হইতে বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র নামক আমাদের একজন

সুবিজ্ঞ সুহৃদ্বর কৃষ্ণনগরে আসিলেন। তদীয় প্রীত্যর্থে তাঁহাকে লইয়া বাবু রামতনু লাহিড়ী, শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী, কালীচরণ লাহিড়ী, তারিণীচরণ রায়, বামাচরণ চৌধুরি প্রভৃতি দশ বার জন আত্মীয় ও আমি কৃষ্ণনগরের দেড়ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ আনন্দবাগ নামে উপবনে বনভোজন করিতে যাইলাম। তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে নৌকায় নৌকায় আমাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব হইল। অনেকেই ইহার অনুকূল প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু কার্য্যকালে সকলেই স্থির-প্রতিজ্ঞ থাকিবেন, ইহা আমার বিশ্বাস হইল না। কয়েক দিবস পরে কৃষ্ণনগর কালেজগৃহে এবিষয়ের জন্য একটী সভা হইল। সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ কালেজের ও স্কুলের ছাত্র।"

"যে দিবস আমরা আনন্দবাগে বনভোজন করি, তাহার পরদিন কোনও হিংস্রক ও দুরাচারী লোক আমার গ্রামস্থ অনেকের নিকট ব্যক্ত করিল যে, আমাদের বাটীর সন্নিহিত কোন স্থানে একটী গো-বৎসের মস্তক কতকগুলি ইষ্টকে আচ্ছাদিত রহিয়াছে ও মাথাটী দেখিয়াই বোধ হয় যেন তাহা অস্ত্র দ্বারা ছেদিত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরে রটনা করিল যে কোনও ব্যক্তির এক গো-বৎস পাওয়া যাইতেছে না। পরদিবস কৃষ্ণনগরে কোন স্থানে বন্ধু-লোকের সমাগম দেখিয়া গো-বৎস বৃত্তান্ত আরও কিঞ্চিৎ রঞ্জিত করিয়া কহিল যে, কেহ কেহ বলিতেছে যে, আনন্দবাগের বনভোজন জন্য এই গো-হত্যাটী হইয়াছে। নগর মধ্যে এই বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল।"

আমি কৃষ্ণনগরের সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি ঐ গো-বৎস হত্যা বৃত্তান্তটী আনন্দবাগের বনভোজনের সহিত সংযুক্ত করিবার আরও একটী কারণ ছিল। যুবকদল বাস্তবিক একটী খাসী মারিয়াছিলেন, এবং তাহার দেহটী একটী বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। একজন লোক দূর হইতে দোদুল্যমান প্রাণিদেহটী দেখিয়া আসে ও নগরমধ্যে গো-বৎস হত্যা বিবরণ প্রচার করে, তারপর দেওয়ানজীর উল্লিখিত পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি তাহাতে সাক্ষ্যযোগ করে। উভয় সাক্ষ্যে মিলাতে লোকের বিশ্বাস জন্মিতে আর বিলম্ব হইল না। সকলেই অনুমান করিতে পারেন, ইহাতে যুবকদলের প্রতি কি ঘোর নির্য্যাতন উপস্থিত হইল।

অনুমান করি পূর্ব্বোক্ত গোহত্যার আন্দোলন ও বিধবা-বিবাহের সভা ১৮৫০ সালের অবসানে বা ১৮৫১ সালের প্রারম্ভে ঘটিয়া থাকিবে এবং সেই

আন্দোলনেই লাহিড়ী মহাশয়ের কৃষ্ণনগর বাস ক্লেশকর করিয়া তুলে। এক-দিকে সামাজিক নির্য্যাতন অপরদিকে বৃদ্ধ পিতা ও আত্মীয় স্বজনের মানসিক অশান্তি এই উভয়বিধ কারণে তাঁহার চিত্তকে উদ্বিগ্ন করিল। ১৮৪৮ কি ১৮৪৯ সালে তাঁহার যে প্রথম পুত্রটী জন্মিয়াছিল, সেটী এই সময়ে একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়া মারা গেল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে খাট হইতে পড়িয়া মস্তকে আঘাত লাগিয়াছিল। ৩।৪ দিবস নানা প্রকার চিকিৎসাতেও জ্ঞান হয় নাই; শেষে তাহার প্রাণ যায়। তাহাতে আত্মীয় স্বজন বিধাতার অভিসম্পাত বলিয়া তাঁহার বালিকা পত্নীকে অস্থির করিয়া তুলেন। এই সকল কারণে ১৮৫১ সালের মার্চ্চমাসে বদলীর প্রার্থনা করিয়া তিনি বর্দ্ধমানে বদলী হইয়া যান। পরবর্ত্তী এপ্রিলমাসে দেড়শত টাকা বেতনে হেড-মাষ্টার হইয়া বর্দ্ধমানে গমন করেন। তাঁহার প্রিয় বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক তখন বর্দ্ধমানে ডেপুটী কালেক্টরী কাজ করিতেছিলেন, তাহাও তাঁহার বর্দ্ধমানে বদলী হইবার অন্যতম কারণ হইয়া থাকিবে।

যখন কৃষ্ণনগরে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সকল ঘটিতেছিল, তখন কলিকাতাতে একটী নূতন কার্য্যের সূত্রপাত হইতেছিল। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ও গবর্ণর জেনেরালের মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন্ বা বেথুন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন। বীটন সাহেব ইংলণ্ডের স্যালফোর্ড নামক স্থান-নিবাসী কর্ণেল জন ড্রিঙ্ক-ওয়াটারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কর্ণেল ড্রিঙ্কওয়াটার জিব্রাল্টার দুর্গের অবরোধের ইতিবৃত্ত লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বীটন যৌবনে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া র‍্যাংলারের সম্মানিত পদ অধিকার করেন। তৎপরে আইন অধ্যয়ন করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের কাউন্সেলের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ হইতে তিনি গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থা-সচিবরূপে এদেশে প্রেরিত হন। তিনি বড় মাতৃভক্ত লোক ছিলেন; এবং এইরূপ কথিত আছে যে, মাতৃভক্তিই তাঁহার স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভারতীয় নারীগণের উন্নতি সাধনের ইচ্ছা সমুৎপন্ন করিয়াছিল।

তিনি এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তাঁহার স্বভাব-সুলভ সদাশয়তার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, এদেশীয়দিগের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে

এই পণ্ডিতদ্বয়ের সাহায্যে ও দেশের ভদ্রলোকদিগের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া তিনি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে দিবসে তন্নাম-প্রসিদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বীটন এই কার্য্যে দেহ মনঃপ্রাণ নিয়োগ করেন; হেয়ার যেমন বালকদিগের শিক্ষা লইয়া মাতিয়াছিলেন, বীটন তেমনি বালিকাদিগের শিক্ষা লইয়া একেবারে মাতিয়া যান। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন; আসিবার সময় বালিকাদিগের জন্য নানা উপহার লইয়া আসিতেন; মধ্যে মধ্যে বালিকাদিগকে নিজ ভবনে লইয়া গিয়া মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়া গৃহে প্রেরণ করিতেন; কখন কখনও চারি পায়ে ঘোড়া হইয়া শিশু বালিকাদিগকে পৃষ্ঠে তুলিয়া খেলা করিতেন। বলিতে কি যে সকল উদারমতি মানব-হিতৈষী ইংরাজ পুরুষের নাম এদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছে, এই মহাত্মা তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি নিজের নাম বঙ্গবাসীদিগের স্মৃতি ফলকে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক ইতিবৃত্তে ইহাঁর নাম চিরদিন উজ্জ্বল তারকার ন্যায় জ্বলিবে।

কিন্তু ১৮৪৯ সালে মহাত্মা বীটন বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন বলিয়া এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে, বঙ্গদেশে তাহাই স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রচলন। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিতেছি :—

১৮১৭ সালে স্কুল সোসাইটী স্থাপিত হওয়া অবধি এই প্রশ্ন উঠে যে বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইবে কি না? এই বিষয় লইয়া সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। রাধাকান্ত দেব উক্ত সোসাইটির অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন; এবং স্কুল সোসাইটীর অধীনস্থ কোন কোনও পাঠশালাতে বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকেও শিক্ষা দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। সম্বৎসর পরে তাঁহার ভবনে স্কুল সোসাইটীর পাঠশালা সকলের বালকদিগের যখন পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইত, তখন বালকদিগের সহিত বালিকারাও আসিয়া পুরস্কার লইয়া যাইত।

এইরূপ কয়েক বৎসর যায়। কিন্তু বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া অনেক সভ্যের অভিপ্রেত হইল না। এই বিষয়ে যে বিচার

উপস্থিত হইল, তাহার ফলস্বরূপ ১৮১৯ সালে বাপ্তিস্ত মিশন সোসাইটীর একজন সভ্য ভারতীয় নারীগণের দুর্দ্দশা ও শিক্ষার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া এক নিবেদন-পত্র বাহির করিলেন। সেই নিবেদন-পত্রের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া Mr. Lawson and Pearce's Seminary নামক তৎকাল-প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের মহিলাগণ একত্র হইয়া ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য এক সভা স্থাপন করিলেন; তাহার নাম হইল—"Female Juvenile Society"। এই সভার মহিলা সভ্যগণ কলিকাতার নানাস্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাধাকান্ত দেব ইঁহাদের উৎসাহ-দাতা হইলেন; এবং নিজে "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর কার্য্য চলিল। ১৮২১ সালে স্কুল সোসাইটীর কতিপয় মহিলা-সভ্যের প্ররোচনায় ইংলণ্ডের British and Foreign School Society র সভ্যগণ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুমারী কুক (Miss Cooke) নাম্নী এক শিক্ষিতা মহিলাকে এদেশে প্রেরণ করিলেন। কুমারী কুক ১৮২১ সালে নবেম্বর মাসে এদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি আসিয়া দেখিলেন যে স্কুল সোসাইটীর সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে উক্ত সভা তাঁহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণে অসমর্থ। এই বিপদে চার্চ্চ মিশনারি সোসাইটীর সভ্যগণ অগ্রসর হইয়া কুমারী কুকের ভার গ্রহণ করিলেন। উক্ত মিশনের অধীন থাকিয়া তিনি উৎসাহের সহিত স্বীয় অবলম্বিত কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি কার্য্যারম্ভ করিবার অগ্রে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাতে মনোনিবেশ করিলেন। যখন মনোযোগ সহকারে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, তখন একদিন শিশুদের বাঙ্গালা শুনিবার জন্য স্কুল সোসাইটীর স্থাপিত কোনও পাঠশালাতে গিয়া দেখেন একটী বালিকা পাঠশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, গুরুমহাশয় তাহাকে বালকদিগের সহিত পড়িতে দিবেন না। অনুসন্ধানে জানিলেন সে বালিকাটীর ভ্রাতা ঐ পাঠশালে পড়ে; শিশু বালিকাটী স্বীয় ভ্রাতার সহিত পড়িবার জন্য গুরু মহাশয়কে মাসাধিক কাল বিরক্ত করিতেছে। কুমারী কুক সেই বালিকার মাতার ও পাড়ার অপরাপর মহিলাদিগের সহিত দেখা করিলেন। অনেক কথোপকথনের পর সেই পাড়াতে বালিকাবিদ্যালয় খোলা স্থির হইল। অল্পদিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ১০টী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং ন্যূনাধিক ২৭৭টী বালিকা শিক্ষা করিতে

লাগিল। কুমারী কুক দুই বৎসর এই ভাবে কাজ করিলেন। অবশেষে তিনি (Mr. Wilson) উইলসন নামক একজন মিশনারি সাহেবের সহিত পরিণীতা হইলেন। বিবাহের পরেও তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে রত রহিলেন বটে, কিন্তু আর পূর্ব্বের ন্যায় সময় দিতে পারিতেন না। এই অভাব দূর করিবার জন্য কলিকাতার কতিপয় ভদ্র ইংরাজ-মহিলা সমবেত হইয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড আমহার্ষ্টের পত্নী লেডী আমহার্ষ্টকে আপনাদের অধিনেত্রী করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-বিধানার্থ বেঙ্গাল লেডীস্ সোসাইটী (Bengal Ladies' Society) নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার মহিলা-সভ্যগণের উৎসাহে ও যত্নে নানা স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যেই ইঁহারা সহরের মধ্যস্থলে একটী প্রশস্ত স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করিলেন। কিছুকাল পরে মহিলাগণ মহা-সমারোহে গৃহের ভিত্তি স্থাপন পূর্ব্বক গৃহনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ গৃহ নির্ম্মাণকার্য্যের সাহায্যার্থ রাজা বৈদ্যনাথ বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন বিষয়ে মহিলাগণ এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বেঙ্গাল লেডীস্ সোসাইটী বহুবৎসর জীবিত থাকিয়া কার্য্য করিয়াছিল। এমন কি ১৮৩৪ সালে এডাম সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে কলিকাতা ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুরশিদাবাদ ও বীরভূম, প্রভৃতি স্থানে ১৯টী বালিকাবিদ্যালয় ও প্রায় ৪৫০ টী বালিকার উল্লেখ দেখা যায়; এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি লেডীস্ সোসাইটীর সভ্য মহোদয়াগণের উৎসাহে স্থাপিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু এই সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের অধিকাংশ খ্রীষ্টীয় মহিলাদিগের স্থাপিত ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের অঙ্গীভূত ছিল।

সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম-শিক্ষাবিহীন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন বীটন্ সাহেব সর্ব্বপ্রথমে করেন। সে কার্য্যের প্রতিষ্ঠা ১৮৪৯ সালে হয়; তাহার বিবরণ অগ্রে দিয়াছি। বীটনের বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইলেই বারাসত, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি মফঃস্বলের ও অনেক স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল।

এই স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন লইয়া কলিকাতার হিন্দু-সমাজে মহা আন্দোলন

উপস্থিত হইল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী-শিক্ষার বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্য যে কেবল গ্রন্থ রচনা করিলেন তাহা নহে, স্বীয় কন্যাকে নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃদগণ স্বীয় স্বীয় ভবনের বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। স্ত্রীশিক্ষা লইয়া সমাজ মধ্যে নানা আলোচনা উপস্থিত হইল। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই বচনালঙ্কৃত নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গাড়ি যখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হা করিয়া তাকাইয়া থাকিত ও নানা কথা কহিত; এবং সুকুমারমতি শিশু বালিকাদিগকে উদ্দেশ করিয়া কত অভদ্র কথাই কহিত। লোকে বলিতে লাগিল—"এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না।" নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিসে বলিতে লাগিলেন;—"বাপ্‌রে বাপ্‌ মেয়েছেলেকে লেখা পড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে! এক "আন" শিখাইয়াই রক্ষা নাই! চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন, করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে!" লোকে শুনিয়া হা হা করিয়া এক গাল হাসিতে লাগিল। বঙ্গের রসিক কবি ঈশ্বর গুপ্তও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন:—

"যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে,
এ বি শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে;
আর কিছু দিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখ্‌তে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

বীটনের বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে যেমন সমাজমধ্যে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং বীটন দেশীয় শিক্ষিতদলের প্রিয় হইলেন, তেমনি রাজনীতি বিষয়ে এক মহা আন্দোলন উঠিল তাহাতে তিনি তাঁহার স্বদেশীয়গণের অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন। এই আন্দোলন অনেক পরিমাণে পরবর্ত্তী সময়ের ইলবার্টবিলের আন্দোলনের অনুরূপ ছিল। ঐ আন্দোলনের প্রকৃতি বুঝিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব ইতিবৃত্তের কিঞ্চিৎ উল্লেখ আবশ্যক।

১৭৬৫ সাল হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী কার্য্যের ভার ইংরাজদিগের প্রতি অর্পিত হইলে, বহু বৎসর ধরিয়া ফৌজদারি কার্য্যের ভার মুসলমান নবাবের হস্তেই ছিল। ইহাতে

রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা না হইয়া ঘোর বিশৃঙ্খলাই উপস্থিত হয়। ক্রমে সে নিয়ম রহিত হইয়া বিচারকার্য্যের সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য কলিকাতাতে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হয়; এবং দেওয়ানী আদালতের ন্যায় নানা স্থানে ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়। মফস্বলে কোম্পানির ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু মফস্বলবাসী ইংরাজগণকে তাহার অধীন করা হইল না। তাঁহারা নামত সুপ্রিমকোর্টের এলাকাধীন রহিলেন; কিন্তু কার্য্যতঃ নিরঙ্কুশ হইয়া রহিলেন। ইহার ফল কি হইল সকলেই তাহা অবগত আছেন। মফস্বলবাসী ইংরাজগণের অত্যাচার প্রজাকুলের অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জিলাতে নীলকরগণ যথেচ্ছাচারী দুর্দ্দান্ত রাজার ন্যায় হইয়া উঠিলেন। অথচ সে অত্যাচার নিবারণের উপায় রহিল না। অত্যাচারী ইংরাজগণ আপনাদিগকে কোম্পানির ফৌজদারী আদালতের বাহিরে রাখিয়া, সুপ্রিমকোর্টের দোহাই দিয়া, স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। ১৮৪৯ সালের পূর্ব্বে এই সকল অত্যাচার এতই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের ও কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকে এই অনিষ্টকর নিয়ম রহিত করিবার জন্য নূতন রাজবিধি প্রণয়নের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তদনুসারে তৎকালীন ব্যবস্থা-সচিব বীটন সাহেব চারিখানি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

1. Draft of an Act abolishing exemption from the jurisdiction of the East India Company's criminal courts.

2. Draft of an Act declaring the privileges of Her Majesty's European subjects.

3. Draft of an Act for the protection of judicial officers.

4. Draft of an Act for trial by jury in the Company's courts.

পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন তদানীন্তন ইংরাজগণ যে কেবল এদেশবাসী অসহায় কৃষ্ণবর্ণ প্রজাকুলের প্রতিই অত্যাচার করিতেন তাহা নহে। তাঁহাদের অত্যাচার হইতে কোম্পানির জুডিশিয়াল অফিসারদিগকেও বাঁচান আবশ্যক হইয়াছিল।

যাহা হউক এই চারিটী আইনের পাণ্ডুলিপি গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভাতে উপস্থিত হইবা মাত্র এদেশবাসী ইংরাজগণ ইহাদের (Black Acts) "কালা আইন" নাম দিয়া, তদ্বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের সম্পাদিত সংবাদ-পত্র সকলে ঐ চারি আইন প্রণেতাদিগের প্রতি অভদ্র গালাগালি বর্ষণ চলিতে লাগিল। বীটন তাঁহাদের উপহাস, বিদ্রুপ ও আক্রোশের লক্ষ্যস্থলে পড়িলেন। ইংরাজগণ কলিকাতাতে এক মহাসভা করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের নিকট আবেদন করা স্থির করিলেন; এবং এদেশে ও ইংলণ্ডে ঐ আন্দোলন চালাইবার জন্য কতিপয় দিবসের মধ্যে ছয়ত্রিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন।

আন্দোলনে দেশ কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এদেশীয়দিগের পক্ষ হইয়া বলিবার কেহই ছিল না। তাহাদের পক্ষ গুছাইয়া বলিতে পারে এমন সংবাদ পত্রই ছিল না। এদেশীয়গণ নীরবে বাদ-বিতণ্ডা শুনিতে লাগিলেন; এবং সদাশয় রাজপুরুষগণের মুখাপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কেবল একমাত্র রামগোপাল ঘোষ উক্ত আইন গুলির পক্ষ হইয়া লেখনী ধারণ করিলেন। তাহার বিবরণ রামগোপালের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে দেওয়া গিয়াছে।

অবশেষে আন্দোলনকারী ইংরাজগণের অভীষ্টই পূর্ণ হইল। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে কালা আইন গুলি ব্যবস্থাপক সভা হইতে অন্তর্হিত হইল। মফস্বলবাসী ইংরাজগণ আরও নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচারে শত শত প্রজার প্রাণ পিষিয়া যাইতে লাগিল।

অতিরিক্ত শ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা ও এই সকল আন্দোলন জনিত উত্তে জনাতে মহাত্মা বীটনের আয়ু সংকীর্ণ করিয়া আনিল। তিনি ১৮৫১ সালের ১২ই আগষ্ট ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ নূতন সমাধিক্ষেত্রে তাহার দেহ সমাহিত রহিয়াছে।

কালা আইনের বিরোধী ইংরাজগণ জয়যুক্ত হইলেন; যে আন্দোলনের ঝড় উঠিয়াছিল তাহা থামিয়া গেল; মহামতি বীটন পরলোক গমন করিলেন; কিন্তু দেশীয় শিক্ষিতদলের মনে একটা গভীর অসন্তোষ থাকিয়া গেল। একতা ও আন্দোলনের দ্বারা কি হয় তাহা তাঁহারা চক্ষের উপরে দেখিলেন। ইংরাজগণ তাঁহাদের চীৎকার-ধ্বনিতে কিরূপে ভুবন কাঁপাইয়া তুলিলেন, কিরূপে দেখিতে দেখিতে শত শত ব্যক্তি একত্র হইলেন, কিরূপে দেখিতে দেখিতে ৩৬ হাজার টাকা তুলিলেন, এ সমুদয় যেন ছায়াবাজীর ন্যায় তাঁহাদের নয়নের

সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইল। রামগোপাল ঘোষ ইংরাজদিগের অবলম্বিত নীতির প্রতিবাদ করাতে এগ্রি-হর্টি কলচুরাল সোসাইটীতে কিরূপে তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইল তাহাও সকলে অবগত আছেন। অনেকে সেই অপমানে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিলেন। এই সকল কারণে শিক্ষিত দলের মধ্যে রাজনীতির আন্দোলনের জন্য সম্মিলিত হইবার বাসনা প্রবল হইল। তাঁহারা বুঝিলেন স্বদেশের হিতের জন্য সমবেত হওয়া আবশ্যক। সে সময়ে দেশীয় শিক্ষিত দলের মধ্যে দুইটী সভা ছিল; প্রথমটী দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত Bengal Landholders' Association বা বঙ্গদেশীয় জমিদার সভা। কলিকাতার অনেক ধনী ব্যক্তি ইহার সভ্য ছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথ বাবুর মৃত্যুর পর ইহা এক প্রকার মৃত্যু দশায় পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় সভাটীর উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি, তাহা জর্জ্জ টমসনের প্রতিষ্ঠিত নব্য-বঙ্গের "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী"। এইরূপ প্রশ্ন উঠিল, উভয় সভাকে মিলিত করা যায় কি না? রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির উদ্যোগে ও উৎসাহে অবশেষে ঐ সম্মিলন কার্য্য সমাধা হইল। ১৮৫১ সালের ৩১ অক্টোবর এক সাধারণ সভা আহূত হইয়া, উক্ত উভয় সভা সম্মিলিত করিয়া বর্ত্তমান "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন" স্থাপিত হইল। তাহার প্রথম কমিটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যাইবে ঐ সভার উদ্যোগকারিগণ কিরূপ সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সমবেত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উক্ত সভার প্রথম কমিটীভুক্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা নিম্নে দিতেছি :—

রাজা রাধাকান্ত দেব—সভাপতি।
রাজা কালীকৃষ্ণ দেব—সহ সভাপতি।
রাজা সত্যশরণ ঘোষাল।
বাবু হরকুমার ঠাকুর।
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।
বাবু রমানাথ ঠাকুর।
বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
বাবু আশুতোষ দেব।
বাবু হরিমোহন সেন।
বাবু রামগোপাল ঘোষ।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত—(রামবাগান)।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ।
বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়।
বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত।
বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সম্পাদক।
বাবু দিগম্বর মিত্র—সহ সম্পাদক।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশনের প্রতিষ্ঠা এই যুগের একটী প্রধান ঘটনা। সভাটী স্থাপিত হইবামাত্র ইহার শক্তি সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন। ইংরাজ রাজপুরুষগণ দেখিলেন দেশীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ আপনাদের অভাব গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার জন্য এবং দেশীয়গণের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। এদেশীয়দিগের প্রতি তাঁহাদের যে উপেক্ষার ভাব ছিল তাহা তিরোহিত হইতে লাগিল। দেশের লোকেও জানিল, তাহাদের হইয়া বলিবার জন্য লোক দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সকল শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি এই নব-প্রতিষ্ঠিত সভার দিকে আকৃষ্ট হইল। লোকে আশার নয়নে ইহাকে দেখিতে লাগিল। এ কথা এখানে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন সে সময়ে সে আশা প্রচুর পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছেন। যখন দেশের লোকের হইয়া বলিবার কেহই ছিল না, তখন তাঁহারাই একমাত্র মুখমাত্র ছিলেন। লোকের হইয়া বলিবার ও তাহাদিগকে সর্ব্ববিধ রাজকীয় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারাই একমাত্র শক্তি ছিলেন। সুতরাং এই সভার প্রতিষ্ঠা সর্ব্বশ্রেণীর মনে হর্ষ ও আশার সঞ্চার করিল।

১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় বর্দ্ধমানে গেলেন বটে, কিন্তু সেখানেও বহুদিন সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার উপবীত পরিত্যাগের গোলোযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার উপবীত পরিত্যাগ সম্বন্ধে দুই প্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রথম,—তিনি কৃষ্ণনগরের বাটীতে তাঁহার জননীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছিলেন, এমন সময় একটী বালক দূরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল,—"এদিকে ত বলা হয় কিছু মানি না, ওদিকে শ্রাদ্ধ কর্ত্তে বসা হয়েছে, পৈতাটী বেশ ঝুলচে, বামনাই দেখান হচ্ছে।" এই বাক্যগুলি লাহিড়ী

মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি মর্ম্মান্তিক লজ্জা পাইলেন। ঐ বালকের বাক্যগুলি তাঁহার অন্তরে শেলসম বিদ্ধ হইল। বাক্য ও কার্য্যের একতা যাঁহার জীবনের মহামন্ত্র ছিল, তাঁহার পক্ষে এই ব্যঙ্গোক্তি কি ক্লেশকর হইবার সম্ভাবনা! এই ঘটনা হইতেই উপবীত পরিত্যাগের সংকল্প তাঁহার মনে উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয়;—১৮৫১ সালের পূজার ছুটীর সময় লাহিড়ী মহাশয় নৌকাযোগে কতিপয় বন্ধুসহ গাজিপুরে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয়-বন্ধু রামগোপাল ঘোষ তখন গাজিপুরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার নিমন্ত্রণে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই, তাঁহারা গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে নৌকার মাল্লাদিগের দ্বারাই পাকাদি কার্য্য করাইয়া আহারাদি চলিতেছিল। একদিন সহচরদিগের মধ্যে একজন কৌতুক করিয়া বলিলেন—"এদিকে ত মাল্লাদের হাতে খাইতেছি, অথচ পৈতাটা রাখিয়া ব্রহ্মণ্য দেখাইতেছি, কি ভণ্ডামই করিতেছি!" বাক্যগুলি কৌতুকচ্ছলে কথিত হইল বটে, কিন্তু তাহা লাহিড়ী মহাশয়ের চিত্তে বিষম গ্লানি উপস্থিত করিল। তিনি তৎপূর্ব্বে আপনার উপবীতটী নৌকার ছত্রীতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন; তাহা আর গ্রহণ করিলেন না।

উভয় বিবরণের মধ্যে কোনও বিবাদ দৃষ্ট হইতেছে না। ইহা সম্ভব যে গাজিপুর যাত্রার পূর্ব্বে তিনি জননীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করেন। সেখানে পূর্ব্বোক্ত বালকটীর বিদ্রূপোক্তি শুনিতে পান। তাহা হইতেই উপবীত পরিত্যাগের সংকল্প তাঁহার অন্তরে উদিত হয়। তৎপরে গাজিপুর যাত্রাকালের ঘটনাটী ঘটে, তাহাতে সেই সংকল্পকে দৃঢ়ীভূত করে। এরূপ একটী গুরুতর পরিবর্ত্তন যে একদিনে ঘটিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। তাহা জীবনের অনেক দিনের সংগ্রামের ফল। আরও অনেকের জীবনে এই প্রকার ভাবেই এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং ইঁহার জীবনেও সেই প্রকার ঘটিয়া থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

যাহা হউক তিনি যখন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তখন এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দু-সমাজের লোকে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার ধোপা নাপিত বন্ধ করিল; দাস-দাসীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নবকুমার তখন শিশু,

তৎপূর্ব্ব চৈত্র মাসে কলিকাতা সহরে তাহার জন্ম হইয়াছিল। সেই শিশুপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসারের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহের ভার তাঁহার বালিকা পত্নীর উপরে পড়িয়া গেল। যিনি অপরের ক্লেশ একটু সহিতে পারিতেন না, সেই লাহিড়ী মহাশয় যে স্বীয় পত্নীর ক্লেশ দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তিনি জল বহা, কাঠ কাটা, বাজার করা প্রভৃতি ভৃত্যের সমুদয় কাজ নিজেই নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে এক দিনের জন্য ক্লান্তি বোধ করিতেন না; অথবা লোকের প্রতি বিরক্তি বা বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন না। শ্রমের অন্ন সুখেই আহার করিতেন; এবং অহরহঃ স্বকর্ত্তব্য সাধনে মনোযোগী থাকিতেন। কিন্তু লোকের নির্য্যাতনের সমুদয় ভার বিশেষ ভাবে তাঁহার পত্নীর উপরেই পড়িত। পাড়ার অজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের অবজ্ঞা-সূচক বাক্যে ও আত্মীয় স্বজনের আর্ত্তনাদে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। তাঁহার মনস্তাপ দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয় ক্ষুণ্ণচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় ঘরে বাহিরে যেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ওদিকে কৃষ্ণনগরে এই উপবীত-ত্যাগের কথা প্রচারিত হইয়া সেখানেও মহা আন্দোলন উপস্থিত করিল। সেখানে সমাজের লোক রামতনু বাবুকে হাতের কাছে না পাইয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা সাধু রামকৃষ্ণকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। বিনা অপরাধে তাঁহাকেও অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইল। তাঁহার স্বভাব-নিহিত ধর্ম্মানুরাগবশতঃ তিনি উগ্রভাব ধারণ করিলেন না; পুত্রকে শাস্তি দিবার পরামর্শ করিলেন না; বা তাঁহার প্রতি বল-প্রয়োগের অভিসন্ধি করিলেন না; কিন্তু মরমে মরিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন। বহুদিন পরে লাহিড়ী মহাশয় যখন আমাদের নিকট তাঁহার পিতার এই সময়কার ভাবের বর্ণনা করিতেন, তখন দর দর ধারে দুই চক্ষে জলধারা বহিত। বস্তুতঃ বলিতে কি আমরা তাঁহাতে একসঙ্গে পিতৃভক্তি ও নিজের বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিবার সাহস উভয় যে প্রকার সম্মিলিত দেখিয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিবার নহে।

বর্দ্ধমানের আন্দোলন বশতঃই হউক অথবা শিক্ষাবিভাগের বন্দোবস্ত বশতঃই হউক এক বৎসরের অধিক কাল তিনি বর্দ্ধমানে থাকেন নাই। ১৮৫২ সালে তিনি বালি-উত্তরপাড়ার ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া আসিলেন।

উত্তর পাড়াতে আসিয়া তাঁহার সামাজিক নির্য্যাতনের ক্লেশের কিঞ্চিৎ

লাঘব হইল। তাঁহার কলিকাতাবাসী বন্ধুগণ নানা প্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় আজ পাচক ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন; কাল পলাইয়া গেল। তিনি আবার পাচক যোগাড় করিয়া পাঠাইলেন। ভৃত্যের পর ভৃত্য পলাইতে লাগিল; বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার পাঠাইতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন গার্হস্থ্য সামগ্রী সকল কলিকাতাতে ক্রয় করিয়া নৌকাযোগে প্রেরণ করিতেন; বন্ধুকে কোনও অভাব অনুভব করিতে দিতেন না। এইরূপে লাহিড়ী মহাশয়ের দিন এক প্রকার কাটিয়া যাইত। উপবীত পরিত্যাগ করিয়া তিনি যখন নির্য্যাতন ভোগ করিতেছিলেন তখন হিন্দুসমাজের আত্মীয় স্বজনের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার শিক্ষিত বন্ধুদিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহাকে পুনরায় উপবীত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সেরূপ পরামর্শের প্রতি কোনও দিন কর্ণপাত করেন নাই।

লাহিড়ী মহাশয় যখন উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে প্রতিষ্ঠিত, তখন কলিকাতা সমাজের নব অভ্যুদয়ের দিন। তখন চারিদিকে ইংরাজী শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হইতেছে; ব্রাহ্মসমাজ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়দ্বয়ের নেতৃত্বাধীনে উদীয়মান শক্তিরূপে উঠিতেছে; এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত বর্ত্তমান গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত করিতেছেন। ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল পঞ্চবিংশতি" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহাতে সুললিত বাঙ্গালা গদ্য রচনার সূত্রপাত হয়। তৎপরে তিনি ১৮৪৮ সালে "বাঙ্গালার ইতিহাস," ১৮৫০ সালে "জীবনচরিত" ও ১৮৫১ সালে "বোধোদয়" মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ১৮৫১ সালে ও ১৮৫২ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সকল প্রচার দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যের এক নবযুগের অবতারণা হইল। বিশেষতঃ "বাহ্যবস্তুর" প্রচার যুবকদলের মধ্যে এক নবভাবকে উদ্দীপ্ত করে। ইহার প্ররোচনাতে অনেকে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করেন; এবং সামাজিক নীতি ও চরিত্র সম্বন্ধে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়।

বাস্তবিক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই সময়ে বঙ্গসমাজের নেতৃগণের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন।

অক্ষয় কুমার দত্ত।

ইং ১৮২০ সালের ১লা শ্রাবণ দিবসে নবদ্বীপের সন্নিহিত চূপী নামক গ্রামে অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত। ইঁহার পিতা বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্ত্তী খিদিরপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার সপ্তম বর্ষ বয়সে গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে বিদ্যারম্ভ করেন। তৎপরে দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইমি খিদিরপুরে নীত হন। সেখানে ইঁহার পিতা ও পিতৃব্যপুত্রগণ তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে ইহাঁকে পারসী ভাষাতে সুশিক্ষিত করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু শিশু অক্ষয়কুমার সে বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া ইংরাজী শিক্ষার জন্য অত্যধিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার অভিভাবকগণ প্রথমে কতিপয় ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ আত্মীয়কে অনুরোধ উপরোধ করিয়া উক্ত ভাষা শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত করিলেন। তাহাতে তিনি আশানুরূপ শিক্ষা করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলেন। অমূল্য সময় চলিয়া যাইতে লাগিল, অথচ পাঠে অল্পই উন্নতি দৃষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে বালক অক্ষয়কুমার ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার জন্য ছিঁড়িয়া পড়িলেন; এবং খিদিরপুরে খ্রীষ্টীয় মিশনারিদিগের একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, তাহাতে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন। ইহাতে তাঁহার অভিভাবকগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে কলিকাতাতে রাখিয়া গৌরমোহন আঢ্যের প্রতিষ্ঠিত "ওরিএণ্টাল সেমিনারি" নামক স্কুলে ভর্ত্তি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর হইবে।

স্কুলে পদার্পণ করিয়াই দত্তজ মহাশয় শিক্ষা বিষয়ে আশ্চর্য্য অভিনিবেশ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্ঞানের বুভুক্ষা যেন কিছুতেই মিটিত না। স্কুলের পাঠ্যগ্রন্থ ভিন্ন যেখানে যে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় হাতে পাইতেন, অতৃপ্ত ক্ষুধার সহিত তাহার উপরে পড়িতেন, এবং তাহাকে অধিগত না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না।

পরিতাপের বিষয় এই, অচিরকালের মধ্যে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে ইঁহাকে লেখা পড়া ছাড়িতে হইল। আড়াই বৎসর কি তিন বৎসরের অধিক কাল বিদ্যালয়ে থাকিতে পারেন নাই। তৎপরে একদিকে যেমন আরাধ্যা জননীদেবীর ভরণপোষণার্থে অর্থোপার্জ্জন চেষ্টা ও তজ্জনিত দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম, অপর দিকে বন্ধু-বান্ধবের নিকট পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত।

১৯৮ পৃষ্ঠা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

চেষ্টা, দুই এক সঙ্গে চলিল। বাস্তবিক কিরূপ ক্লেশে দিন যাপন করিয়া তিনি জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সময়ে তিনি যে যে বিষয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষা একটী। তিনি একাগ্রতার সহিত কতিপয় পণ্ডিতের নিকট পাঠ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তৎপরে কিছুদিন বহু দারিদ্র্যভোগ করিয়া ১৮৪০ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক স্থাপিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাতে ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষকতা কার্য্য লাভ করেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তত্ত্ব-বোধিনী-সভার অধিবেশনে লইয়া যান এবং তাঁহারই উৎসাহে তিনি উক্ত সভার সভাশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকরূপে তিনি প্রথম মাসে ৮৲ তৃতীয় মাসে ১০৲ ও তৎপরে ১৪৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন পাইতেন। তদনন্তর ১৮৪৩ সালে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইলে ইনি তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই তত্ত্ববোধিনীর সংশ্রবই তাঁহার সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল কারণ হইল। এতদ্দ্বারা এক দিকে যেমন তাঁহার আয় বৃদ্ধি হইল, অপর দিকে তেমনি প্রশস্ত জ্ঞানের দ্বার তাঁহার নিকটে উন্মুক্ত হইল। এই সময়ে তিনি কিছুদিন মেডিকেল কালেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিয়া উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি তত্ত্ব-বোধিনী সভার সাহায্যে ভূরি ভূরি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করাতে যে মানুষ যে কার্য্যের উপযোগী যেন তাঁহার হস্তে সেই কার্য্যই আসিল। তিনি পদোন্নতি ও ধনাগমের বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজের ও দেশীয়গণের জ্ঞানোন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন। তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না। "রসরাজ", "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও "প্রভাকর" ও "ভাস্করের" ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়া-জনক বিষয় বাহির হইত, যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে

পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। রামগোপাল ঘোষ একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন—"রামতনু! রামতনু! বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ," বলিয়া তত্ত্ব বোধিনী পাঠ করিতে দিলেন।

১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত অক্ষয় বাবু দক্ষতা সহকারে তত্ত্ব-বোধিনীর সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে অর্থোপার্জ্জনের কত উপায় তাঁহার হস্তের নিকট আসিয়াছে, তিনি তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নাই। এই কার্য্যে তিনি এমনি নিমগ্ন ছিলেন যে, এক এক দিন জ্ঞানালো-চনাতে ও তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত, তিনি তাহা অনুভবও করিতে পারিতেন না।

এই কালের মধ্যে অক্ষয় বাবু আর একটী মহৎ কার্য্য সংসাধন করিয়া-ছিলেন, যে জন্য তাঁহার নাম ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার প্রকৃতি অগ্রে বর্ণন করিয়াছি, তিনি সহজে স্বীয় অবলম্বিত কোনও মত বা কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতেন না। শীঘ্র কিছু অবলম্বন করিতেন না, করিলে শীঘ্র ছাড়িতেন না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, ঈশ্বরালোকে, বহু পরীক্ষার পর কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতেন; এবং একবার যাহা নির্ণীত হইত তাহা হইতে সহজে বিচলিত হইতেন না। সুতরাং তাঁহাকে বেদান্তধর্ম্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয় বাবুকে বহু প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয় বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততা বাদ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সাহায্যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামক গ্রন্থ সংকলিত হইল; ইহা চিরদিন মহর্ষির ধর্ম্মজীবনের পরিণত ফল স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। যে ১৮৫২ সালের কথা কহিতেছি, তখনও এই মহা পরিবর্ত্তন ব্রাহ্মসমাজকে ও সমগ্র বঙ্গদেশকে আন্দোলিত করিতেছে। তখনও দত্তজ মহাশয় স্বীয় মতের জয় দেখিয়া

মহোৎসাহে উদার, আধ্যাত্মিক, একেশ্বরবাদের মহানিনাদে তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ সকলকে পূর্ণ করিতেছেন।

ইহার পরেও অক্ষয় বাবু কয়েক বৎসর কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন। মধ্যে নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে কিছুদিনের জন্য তাহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রিয় তত্ত্ববোধিনীর সংশ্রব একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। অবশেষে ১৮৫৫ সালের আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার পর এক দিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। তখন অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইল বটে, কিন্তু দুই দিবস পরে একদিন তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতেছেন এমন সময়ে মস্তিষ্কের এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব জ্বালা হওয়ায় লেখনী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তদবধি সে লেখনী আর ধারণ করিতে পারেন নাই।

আশ্চর্য্য জ্ঞানস্পৃহা! আশ্চর্য্য কার্য্যশক্তি! ইহার পরে এক প্রকার জীবন্মৃত অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অধিক কি তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক সুবিখ্যাত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ এই অবস্থাতেই সংকলিত। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি তিনি প্রাতঃকালে, সুস্নিগ্ধ সময়ে শয্যাতে শয়ন করিয়া কোনও দিন এক ঘণ্টা কোনও দিন দেড় ঘণ্টা করিয়া মুখে মুখে বলিতেন, এবং কেহ লিখিয়া লইত, এইরূপ করিয়া এ সকল মহাগ্রন্থ সংকলিত হইয়াছিল।

জীবনের অবসান কালে তিনি বালি গ্রামের গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক উদ্যান-বাটীতে থাকিয়া এইরূপে গ্রন্থ রচনা করিতেন; এবং অবশিষ্ট কাল উদ্ভিদ-তত্ত্বের আলোচনা, ও সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত জ্ঞানানুশীলনে কাটাইতেন। সেখানে বাঙ্গালা ১২৯৩ বা ইং ১৮৮৬ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার দেহান্ত হয়।

এদিকে যে ১৮৫২ সালে লাহিড়ী মহাশয় উত্তরপাড়াতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, সেই সময়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশনের স্থাপন, বঙ্গসাহিত্যের বিকাশ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অভ্যুদয় ও ব্রাহ্মসমাজের মত-বিপ্লব কেবলমাত্র এই সকলই যে বঙ্গসমাজকে আন্দোলিত করিতেছিল তাহা নহে, আর একটী বিশেষ কারণে তখন কলিকাতা সমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ ও যে শক্তিশালী পুরুষ তাহার নেতা হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনেরও কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে।

হীরা বুলবুল নামে এক প্রসিদ্ধ বারাঙ্গনা তখন কলিকাতা সহরে বাস করিত। ঐ হীরা বুলবুল একজন পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক ছিল। হীরা সহরের অনেক ধনী ও পদস্থ লোকের সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছিল। অনুমান করি ১৮৫২ সালের শেষে বা ১৮৫৩ সালের প্রারম্ভে হীরা আপনার একটী পুত্রকে, (নিজ গর্ভজাত কি পালিত তাহা জানি না,) তদানীন্তন হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি করিবার জন্য পাঠায়। ইহাতে বারাঙ্গনার পুত্রকে হিন্দুসন্তান বলিয়া কালেজে ভর্ত্তি করা হইবে কি না, এই বিচার উঠে। এরূপ শুনিতে পাই, তাহাকে ভর্ত্তি করা হইবে কি না এই বিষয় লইয়া তদানীন্তন এডুকেশন কাউন্সিল ও হিন্দু-কালেজের ম্যানেজিং কমিটীর মধ্যে মতভেদ ঘটে। সেই মতভেদ সত্ত্বেও বালকটিকে ভর্ত্তি করাতে সহরের দেশীয় হিন্দু ভদ্রলোকদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ত-পরিবারের সুবিখ্যাত বংশধর রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই আন্দোলনের সারথি হইয়া, এই ১৮৫৩ সালের শেষে বা ১৮৫৪ সালের প্রারম্ভে, হিন্দু মেট্রপলিটান কালেজ নামে এক কালেজ স্থাপন করেন। সিন্দুরীয়াপটীস্থ সুপ্রসিদ্ধ গোপাল মল্লিকের বিশাল প্রাসাদে এই কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে কাপ্তেন ডি, এল. (রিচার্ডসন্ এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহামতি (বীটন) বেথুন সাহেবের সহিত বিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে অবসৃত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্র বাবু তাঁহাকে ঐ কালেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

কাপ্তেন সাহেব বঙ্গদেশীয় সৈন্যবিভাগের কর্ণেল ডি, টি, রিচার্ডসনের পুত্র। তিনি ১৮১৯ সালে বঙ্গদেশীয় সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮২২ সালে তিনি একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেন এবং কবিত্বখ্যাতি লাভ করেন। ১৮২৪ সালে স্বাস্থ্যের জন্য ইংলণ্ডে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তৎপর বৎসর আর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন; তাহাতে দেশ বিদেশে তাঁহার সুখ্যাতি বাহির হয়। ১৮২৯ সালে বিলাতে থাকিয়া তিনি মাসিক পত্রিকাদি সম্পাদন দ্বারা আরও খ্যাতি লাভ করেন। তৎপরে এদেশে আগমন করেন। ১৮৩৬ সালে তিনি হিন্দুকালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ভারতীয় যুবক-গণের পাঠোপযোগী কয়েকখানি কাব্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। সে সময়ে যাঁহারা তাঁহার নিকট ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা আর সে কথা জীবনে ভুলিবেন না। কিন্তু কাপ্তেন সাহেবের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে লোকে নানা কথা কহিত। এমন কি ক খনও কখনও সেই বিষয় লইয়া কালেজের

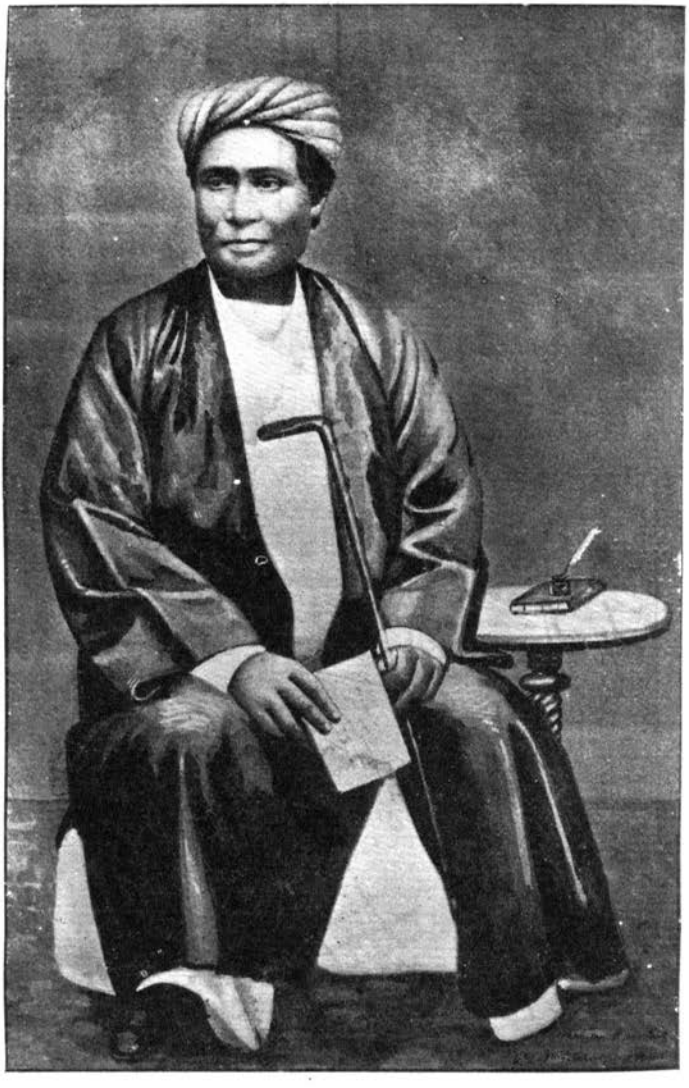

স্বর্গীয় রাজেন্দ্র দত্ত।

(২০৩ পৃষ্ঠা)

B. Kar, Bee Press.

ছাত্রেরাও উপহাস বিদ্রুপ করিত। কাপ্তেন সাহেবের আর একটী দোষ ছিল, তিনি বড় বাবু ছিলেন; আয় ব্যয়ের সমতার প্রতি কখনও দৃষ্টি রাখিতেন না। ইহার ফল স্বরূপ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কারণে এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহাত্মা বেথুনের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। বেথুন তাঁহাকে সাবধান হইতে পরামর্শ দেন, কাপ্তেন সাহেব তাহাতে বিরক্ত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

যাহা হউক কাপ্তেন সাহেবকে অধ্যক্ষ করিয়া মহা সমারোহে হিন্দু মেট্রপলিটান কালেজের কার্য্যারম্ভ হয়। এই কালেজ কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল; কিন্তু প্রতিষ্ঠাকালে ইহা কলিকাতাস্থ হিন্দুসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি পরবর্ত্তী সময়ের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি ইহার ছাত্রদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যে রাজেন্দ্র দত্ত বা কলিকাতাবাসীর সুপরিচিত "রাজা বাবু" এই কার্যের প্রধান সারথি ছিলেন, তাঁহার জীবনচরিত সংক্ষেপে বিবৃত্ত হইল।

রাজেন্দ্র দত্ত।

রাজেন্দ্র দত্ত সুপ্রসিদ্ধ অক্রূর দত্তের পরিবারে ১৮১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই ইঁহার পিতা পার্ব্বতীচরণ দত্তের পরলোক হওয়াতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত দুর্গাচরণ দত্ত তাঁহার অভিভাবক হন। দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয় তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে ড্রমণ্ড সাহেবের স্থাপিত সুপ্রসিদ্ধ একাডেমিতে ভর্ত্তি করিয়া দেন। সেখানে কিছুদিন পড়িয়া তিনি হিন্দুকালেজে যান। সেখানে গিয়া রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি সমাধ্যায়ী ডিরোজিও শিষ্যদলের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন মেডিকেল কালেজের অতিরিক্ত ছাত্ররূপে সেখানকার উপদেশাদি শ্রবণ করেন। সেই সময় হইতেই ইঁহার চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়; এবং বোধ হয় মনে মনে এই সংকল্পও জন্মে যে চিকিৎসার দ্বারা লোকের দুঃখহরণরূপ পরোপকারব্রতে আপনাকে অর্পণ করিবেন। বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কিছুদিন সওদাগর আফিসে বেনীয়ানের কাজ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বীয় অভীষ্ট কর্ত্তব্যপথ হইতে কিছুতেই ইঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। এই সময়ে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সমবেত হইয়া স্বীয় ভবনে একটী এলোপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন

করিয়া দীন দরিদ্রের চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ আরম্ভ করেন। সে সময়ের লোকেরা বলেন এই কার্য্য দ্বারা তিনি সহরে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার বহুল-প্রচার করিয়াছিলেন।

এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে থাকিতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এই সময়ে কয়েকজন সুবিখ্যাত ইউরোপীয় হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার এদেশে আসিলেন। তন্মধ্যে Dr. Tonnere অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রাজা বাবু Dr. Tonnere কে সহরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানাধীনে একটী হোমিও-প্যাথিক হাস্পাতাল স্থাপন করিয়া বিধিমতে হোমিওপ্যাথির প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই হাঁসপাতালটী বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু রাজা বাবু তাহাতে ভগ্নোদ্যম হন নাই। শুনিতে পাই তাঁহারই চেষ্টাতে ও তদানীন্তন গভর্ণর জেনেরালের সহায়তায় Dr. Tonnere কলি-কাতা সহরের প্রথম হেলথ্ অফিসার নিযুক্ত হন।

হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা করিতে গিয়া তাঁহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল যে, এই চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা তিনি দরিদ্রজনের বিশেষ উপকার করিতে পারিবেন। এ সংস্কার চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল এবং মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তিনি সেই বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন।

যে কারণে ও যেরূপে তিনি মেট্রপলিটান কালেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই বর্ণন করিয়াছি। বলা বাহুল্য সেজন্য তাঁহাকে অনেক অর্থের ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হিন্দু মেট্রপলিটান কালেজ প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই, গভর্ণমেণ্ট এই নিয়ম স্থাপন করেন যে হিন্দুকালেজের স্কুল বিভাগে হিন্দুসন্তান ভিন্ন অন্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কিন্তু কালেজবিভাগের দ্বার সর্ব্বশ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। তদনন্তর হিন্দু মেট্রপলিটান কালেজের স্বতন্ত্র সত্তার কারণ চলিয়া যায় এবং তাহা কয়েক বৎসর থাকিয়াই বিলুপ্ত হয়।

রাজা বাবু শেষ দশায় Dr. Beriegnyকে সহায় করিয়া হোমিওপ্যাথির প্রচারে ও পরোপকারে প্রাণ-মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। দিনে নিশীথে রোগশয্যার পার্শ্বে যাইবার জন্য কেহ ডাকিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইতেন; এবং দিনের পর দিন বিনা ভিজিটে, অনেক সময় নিজ ব্যয়ে গিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতেন। আমি অনেক বার তাঁহার

গাড়িতে, তাঁহার সঙ্গে রোগী দেখিতে গিয়াছি ও তিনি কিরূপ একাগ্রতার সহিত চিকিৎসা করিতেন তাহা দেখিয়াছি। রোগীকে বাঁচাইবার জন্য সে ব্যগ্রতা, পরিবার পরিজনের সঙ্গে সেই সমদুঃখসুখতা আর দেখিব না। এইরূপ পরোপকার ব্রতে রত থাকিতে থাকিতে ১৮৮৯ সালের জুন মাসে তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করেন।

আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিলেই বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের অবসান হয়। সেটী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টারদিগের ১৮৫৪ সালের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় পত্র। উক্ত সালে ইংলণ্ড হইতে এদেশে এক আদেশ পত্র আসে। এরূপ শুনা যায় ঐ আদেশ পত্র রচনা বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের হস্ত ছিল। ঐ পত্রে ডাইরেক্টারগণ ভারতীয় প্রজাকুলের শিক্ষাবিধানকে তাঁহাদের অবশ্য-প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এবং এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায় সকল অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন। (১) শিক্ষাবিভাগ নামে রাজকার্য্যের একটী স্বতন্ত্র বিভাগ সংগঠন; (২) প্রাদেশিক রাজধানী সকলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন; (৩) স্থানে স্থানে নর্ম্মাল-স্কুল স্থাপন; (৪) তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট-স্থাপিত স্কুল ও কালেজগুলির সংরক্ষণ ও তাহাদের সংখ্যা বর্দ্ধন; (৫) মিডলস্কুল নামে কতকগুলি নূতন শ্রেণীর স্কুল স্থাপন; (৬) বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও বাঙ্গালা শিক্ষার উন্নতি-বিধান; (৭) প্রজাদিগের স্থাপিত বিদ্যালয়ে সাহায্য-দান প্রথা প্রবর্ত্তন। ১৮৫৮ সালে ভারতরাজ্য মহারাণীর হস্তে আসিলে যখন ষ্টেট সেক্রেটারির পদ সৃষ্ট হইল, তখন ডিরেক্টারগণের অবলম্বিত পূর্ব্বোক্ত প্রণালীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই উভয় পত্রকে এদেশীয় শিক্ষাকার্য্যের সুদৃঢ় ভিত্তি বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

১৮৫৫ সাল হইতেই নব-প্রতিষ্ঠিত প্রণালীর ফল দৃষ্ট হইতে লাগিল। ১৮৫৫-৫৬ সালে একজন ডিরেক্টারের অধীনে শিক্ষা বিভাগ নামে রাজ-কার্য্যের এক বিভাগ সংগঠন করা হইল; স্কুল সকল পরিদর্শনের জন্য একদল ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হইলেন; স্থানে স্থানে শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য নর্ম্মাল বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইল; গভর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্য পাইয়া নানা-স্থানে নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুল সকল দেখা দিতে লাগিল; এবং গ্রামে গ্রামে মিডল স্কুল ও বাঙ্গালা স্কুল সকল স্থাপিত হইতে লাগিল।

এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় উত্তরপাড়া স্কুলে একাগ্রতার

সহিত স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। সে সময়ে যাঁহারা তাঁহার ছাত্র ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার পাঠনার রীতি বড় চমৎকার ছিল। তিনি বৎসরের মধ্যে পাঠ্যগ্রন্থের সমগ্র পড়াইয়া উঠিতে পারিতেন না। কিন্তু যেটুকু পড়াইতেন, সে টুকুতে ছাত্রগণকে এরূপ ব্যুৎপন্ন করিয়া দিতেন, যে তাহার গুণে পরীক্ষাকালে ছাত্রগণ সন্তোষজনক ফল লাভ করিত। ফলতঃ জ্ঞাতব্য বিষয় যোগান অপেক্ষা জ্ঞান-স্পৃহা উদ্দীপ্ত করার দিকে তাঁহার অধিক যত্ন ছিল। বিশেষতঃ যখন ধর্ম্ম বা নীতি বিষয়ে কিছু উপদেশ দিবার অবসর আসিত, তখন তিনি উৎসাহে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। নীতির উপদেশটী ছাত্রগণের মনে মুদ্রিত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যাহা বলিতেন তাহার পশ্চাতে তাঁহার প্রেম ও উৎসাহ-পূর্ণ হৃদয় এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার জলন্ত সত্যনিষ্ঠা-পূর্ণ জীবন থাকিত, সুতরাং তাঁহার উপদেশ আগুনের গোলার ন্যায় ছাত্রগণের হৃদয়ে পড়িয়া সুমহৎ আকাঙ্ক্ষার উদয় করিত। এই সময়ে যাঁহারা তাঁহার নিকটে পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেদিনের কথা কখনই ভুলিতে পারেন নাই।

লাহিড়ী মহাশয় ১৮৫২ সাল হইতে ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। এইখানে অবস্থানকালে তাঁহার লীলাবতী ও ইন্দুমতী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ১৮৫৪ সালে লীলাবতী ভূমিষ্ঠা হয়, ১৮৫৬ সালে ইন্দুমতীর জন্ম হয়। এখানে যে অল্পকাল ছিলেন তন্মধ্যে তিনি ছাত্রগণের কিরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। ঐ স্কুলে তাঁহার স্মৃতি চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য তাঁহার অনুরক্ত ছাত্রগণ বহুবৎসর পরে উক্ত স্কুলগৃহে যে প্রস্তর-ফলক স্থাপন করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

"THIS TABLET TO THE MEMORY OF
BABU RAMTONOO LAHIRI
IS PUT UP BY HIS SURVIVING UTTERPARA SCHOOL PUPILS
AS A TOKEN OF THE LOVE, GRATITUEE, AND VENERATION
THAT HE INSPIRED IN THEM, WHILE HEAD MASTER OF THE
UTTERPARA SCHOOL FROM 1852 TO 1856, BY HIS LOVING
CARE FOR THEM, BY HIS SOUND METHOD OF INSTRUCTION,
WHICH AIMED LESS AT THE MERE IMPARTATION OF KNOWLEDGE
THAN AT THAT SUPREME END OF ALL EDUCATION,
THE HEALTHY STIMULATION OF THE INTELLECT, THE EMOTIONS,
AND THE WILL OF THE PUPIL, AND, ABOVE ALL
BY THE EXAMPLE OF THE NOBLE LIFE THAT HE LED."

Born December 1813 ; Died, August 1898.

লাহিড়ী মহাশয়ের শিক্ষকতা কিরূপ ফলদায়ক হইয়াছিল উক্ত প্রস্তর-ফলকই তাহার প্রমাণ।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদ্যাসাগর-যুগ।

এক্ষণে আমরা বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তের যে যুগে প্রবেশ করিতেছি, তাহার প্রধান পুরুষ পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এককালে রামমোহন রায় যেমন শিক্ষিত, ও অগ্রসর ব্যক্তিগণের অগ্রণী ও আদর্শপুরুষরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং তাঁহার পদভরে বঙ্গসমাজ কাঁপিয়া গিয়াছিল, এই যুগে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মানব-চরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিস, উগ্র-উৎকট-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন তেজীয়ান পুরুষগণ ধনবলে হীন হইয়াও যে সমাজমধ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, তাহা আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া জানিয়াছি। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, যাঁহার পিতার দশ বার টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময়

অর্দ্ধাশনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কিরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন—"ভরতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতাশুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।" আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম, এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনি ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে। সেই চরিত্রবীর পুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত দিয়া এই পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিতেছি, কারণ একদিকে লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত অকপট মিত্রতা সূত্রে তিনি বদ্ধ ছিলেন, অপর দিকে বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্ত গঠন বিষয়ে তিনি এই যুগের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ ছিলেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮২০ সালে, মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যে ব্রাহ্মণকুলে তিনি জন্মিলেন, তাঁহারা গুণগৌরবে ও তেজস্বিতার জন্য সে প্রদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ কোনও পারিবারিক বিবাদে উত্যক্ত হইয়া স্বীয় পত্নী দুর্গাদেবীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিছুকালের জন্য দেশান্তরী হইয়া গিয়াছিলেন। দুর্গাদেবী নিরাশ্রয় হইয়া বীরসিংহ গ্রামে স্বীয় পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস সেই সময় হইতে ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিয়া জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ১৫ বৎসর হইবে তখন জননীর দুঃখনিবারণার্থ অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশে কলিকাতাতে আগমন করেন। এই অবস্থাতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত যে ঘোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহার হৃদয়বিদারক বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অনেক দিনের পর, অনেক ক্লেশ ভুগিয়া, অবশেষে একটী ৮৲ টাকা বেতনের কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। এই অবস্থাতে গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়, ঈশ্বরচন্দ্র ইঁহাদের প্রথম সন্তান।

বিদ্যাসাগর মহাশয় শৈশবে কিয়ৎকাল গ্রাম্যপাঠশালাতে পড়িয়া পিতার সহিত কলিকাতাতে আসেন। কলিকাতাতে আসিয়া তাঁহার পিতার মনিব

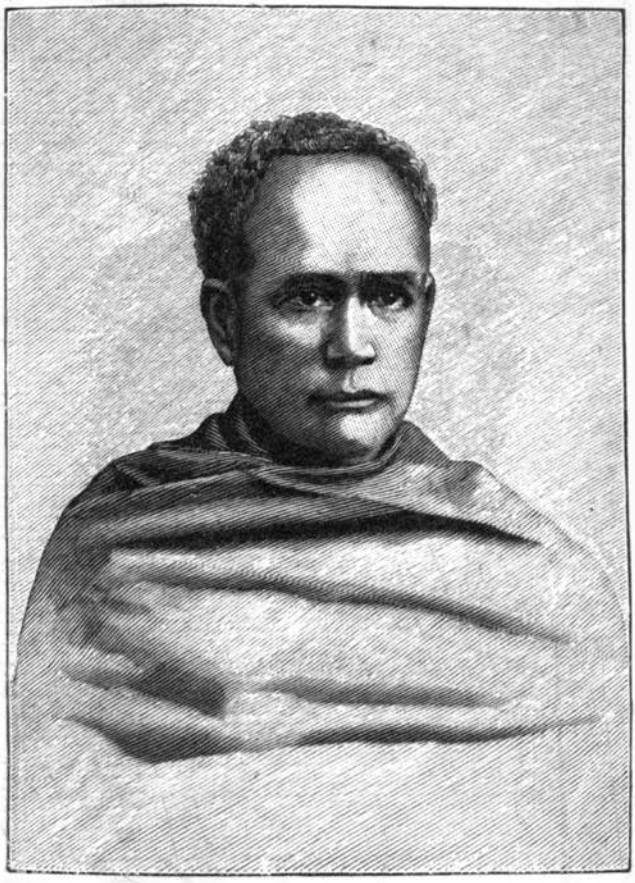

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(২০৮ পৃষ্ঠা)

B. Kar, Bee Press.

বড়বাজারের ভাগবতচরণ সিংহের ভবনে পিতার সহিত বাস করিতে আরম্ভ করেন। পিতাপুত্রে রন্ধন করিয়া খাইতেন। অতি কষ্টে দিন যাইত। এই সময়ে ভাগবতচরণ সিংহের কনিষ্ঠা কন্যা রাইমণি তাঁহাকে পুত্রাধিক যত্ন করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোমল হৃদয় কোনও দিন সে উপকার বিস্মৃত হয় নাই। বৃদ্ধবয়সেও রাইমণির কথা বলিতে দর দর ধারে তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিত।

কলিকাতাতে আসিয়া কয়েক মাস পাঠশালে পড়িবার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা তাঁহাকে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কালেজে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা শিক্ষক ও ছাত্র সকলের গোচর হইল। ১৮২৯ সালের জুন মাসে তিনি ভর্ত্তি হইলেন, ছয় মাসের মধ্যেই মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। সেই বৃত্তি সহায় করিয়া তিনি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কালেজের সমুদয় উচ্চবৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করিলেন। সে সময়ে মফস্বলের ইংরাজ জজদিগের আদালতে এক একজন জজ-পণ্ডিত থাকিতেন। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে ব্যবস্থা দেওয়া তাঁহাদের কার্য্য ছিল। সংস্কৃত কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ঐ কাজ প্রাপ্ত হইতেন। তাহা একটা প্রলোভনের বিষয় ছিল। কিন্তু উক্ত কর্ম্মপ্রার্থীদিগকে ল কমিটী নামক একটী কমিটীর নিকট পরীক্ষা দিয়া কর্ম্ম লইতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়ঃক্রম যখন ১৭ বৎসরের অধিক হইবে না, তখন ল কমিটীর পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিপুরার জজ-পণ্ডিতের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন; কিন্তু পিতা ঠাকুরদাস এত দূরে যাইতে দিলেন না।

১৮৪১ সালে তিনি কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর উপাধি পাইয়া ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি বাড়ীতে বসিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সকলে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন, কিন্তু তিনি ইংরাজীতে কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, কি সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, তাহা অনেকে জানেন না; এমন কি তাঁহার হাতের ইংরাজী লেখাটীও এমন সুন্দর ছিল যে, অনেক উন্নত উপাধিধারী ইংরাজী-ওয়ালাদের হাতের লেখাও তেমন সুন্দর নয়। এ সমুদয় তিনি নিজ চেষ্টা যত্নে করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছা এরূপ প্রবল ছিল যে তাঁহার

সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেরই মনে ঐ ইচ্ছা সংক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে প্রতিষ্ঠিত, তখন তথাকার কেরাণীর কর্ম্মটী খালি হইলে, তাঁহারই চেষ্টাতে তাঁহার তদানীন্তন বন্ধু বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে কর্ম্মটী প্রাপ্ত হন। দুর্গাচরণ বাবু ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ঐ কর্ম্মে থাকিয়া, মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি হইয়া চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত করেন। তাহাই দুর্গাচরণ বাবুর সকল ভাবী উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার কারণ। ইনি সুপ্রসিদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। এই সময়ে আর এক বন্ধুর দ্বারা আর এক কার্য্যের সূত্রপাত হয়। প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবসরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহাকে সংস্কৃত শিখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুভব করিলেন যে, তাঁহারা নিজে যে প্রণালীতে সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন সে প্রণালীতে ইহাঁকে শিখাইলে চলিবে না, অনর্থক অনেক সময় যাইবে। সুতরাং নিজে চিন্তা করিয়া এক নূতন প্রণালীতে তাঁহাকে সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার উত্তরকালে রচিত উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ-কৌমুদী প্রভৃতির সূত্রপাত হইল।

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কালেজের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পদ পাইলেন। কিন্তু উক্ত কালেজের অধ্যক্ষ রসময় দত্ত মহাশয়ের সহিত মতভেদ হওয়াতে দুই এক বৎসরের মধ্যে ঐ পদ পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৮৫০ সালের প্রারম্ভে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের কেরাণীগিরি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করাতে, মার্শেল সাহেবের অনুরোধে, মাসিক ৮০ টাকা বেতনে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সে পদে তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। ঐ সালেই তাঁহার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের কর্ম্ম পাইয়া চলিয়া যাওয়াতে সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শূন্য হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহাত্মা বেথুনের পরামর্শে ঐ পদ গ্রহণ করিলেন। সেই পদ হইতে ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন।

অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি নানা প্রকার সংস্কার কার্য্যে হস্তার্পণ করেন। প্রথম, প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকগুলির রক্ষণ ও মুদ্রণ; (২য়) ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য জাতির ছাত্রগণের জন্য কালেজের দ্বারা উদ্ঘাটন; (৩য়) ছাত্রদিগের বেতন গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তন, (৪র্থ) উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি প্রণয়ন, (৫ম) ২ মাস গ্রীষ্মাবকাশ প্রথা প্রবর্ত্তন (৬ষ্ঠ) সংস্কৃতের সহিত ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন। সংস্কৃত কালেজের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এই সকল পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে কত চিন্তা ও কত শ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা আমরা এখন কল্পনা করিতে পারি না। সে কালের লোকের মুখে তাঁহার শ্রমের কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

ইহার পর দিন দিন তাঁহার পদবৃদ্ধি ও খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বেই বহিয়াছি ১৮৪৭ সালে তাঁহার "বেতাল পঞ্চবিংশতি" মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। "বেতাল" বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত করিল। তৎপরে ১৮৪৮ সালে "বাঙ্গালার ইতিহাস." ১৮৫০ সালে "জীবনচরিত" ১৮৫১ সালে "বোধোদয়" ও "উপক্রমণিকা," ১৮৫৫ সালে "শকুন্তলা" ও "বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব" প্রকাশিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট পরিচিত হইল।

শিক্ষাবিভাগে ইনস্পেক্টারের পদ সৃষ্ট হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদের উপরে, নদীয়া, হুগলি, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের ইনস্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হন। এক দিকে যখন তাঁহার পদ ও শ্রম বাড়িল, তখন অপর দিকে তিনি এক মহাব্রতে আত্মসমর্পণ করিলেন। সেই সালেই বিধবা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থ প্রচার করিলেন। বঙ্গদেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সমাজসংস্কারে এই তাঁহার প্রথম হস্তক্ষেপ নয়। ১৮৪৯ সালে মে মাসে বেথুন সাহেব যখন বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি ও তাঁহার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন কার্য্যে আপনাদের দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করেন।

১৮৫৬ সাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাল। এই বৎসরে তাঁহার কার্য্যপটুতা যে কত তাহা জানিতে পারা গেল। এক

দিকে বিধবাবিবাহের প্রতিপক্ষগণের আপত্তিখণ্ডনার্থ পুস্তক প্রণয়ন, বিধবাবিবাহ প্রচলনার্থ রাজবিধি প্রণয়নের চেষ্টা; কার্য্যতঃ বিধবাবিবাহ দিবার আয়োজন, এই সকলে তাঁহাকে ব্যাপৃত হইতে হইল; অপরদিকে এই সময়েই শিক্ষাবিভাগের নব-নিযুক্ত ডিরেক্টার মিষ্টার গর্ডন ইয়ংএর সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ বাঁধিয়া গেল। এই বিবাদ প্রথমে জেলায় জেলায় বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন লইয়া ঘটে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নদীয়া, হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর এই কয় জেলার স্কুল ইনস্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইলেই, নানা স্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনে করিলেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য তাঁহার যে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, তাহা কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় ও সুবিধা উপস্থিত। তিনি উৎসাহের সহিত তাঁহার সংকল্প সাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইয়ং সাহেব, বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টের অর্থ ব্যয় করিতে অস্বীকৃত হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত বিল স্বাক্ষর করিলেন না। এই সংকটে বিদ্যাসাগর মহাশয় লেপ্টনাণ্ট গভর্ণরের শরণাপন্ন হইলেন। সে যাত্রা তাঁহার মুখ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু ডিরেক্টার তাঁহার প্রতি হাড়ে চটিয়া রহিলেন। কথায় কথায় মতভেদ ও বিবাদ হইতে লাগিল। এই বিবাদ ও উত্তেজনাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্ত এই বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিশয় আন্দোলিত ছিল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বিবিধ চেষ্টাসত্ত্বেও এই বিবাদের মীমাংসা না হওয়ায় অবশেষে ১৮৫৮ সালে তাঁহাকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়।

এদিকে ১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন উঠিল, তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রানুসারে বিধবাবিবাহের বৈধতা লইয়া যে বিচার চলিতেছিল তাহা পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। রাজবিধিপ্রণয়নের চেষ্টা আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলন কিঞ্চিৎ থাকিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যখন কার্য্যতঃ বিধবাবিবাহ প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আপামর সাধারণ সকল লোকে একেবারে জাগিয়া উঠিল। পথে, ঘাটে, হাটে বাজারে, মহিলাগোষ্ঠীতে এই কথা চলিল।

শান্তিপুরের তাঁতীরা "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে" —এই গানাঙ্কিত কাপড় বাহির করিল। এমন কি বিদ্যাসাগরের প্রাণের উপরেও লোকে হাত দিবে এরূপ আশঙ্কা বন্ধুবান্ধবের মনে উপস্থিত হইল।

এই সকল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রামের মধ্যে যে কতিপয় বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উৎসাহ ও হৃদয়ের অনুরাগ দানে সবল করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় একজন। তিনি ১৮৫৭ সালে উত্তরপাড়া স্কুল হইতে বদলী হইয়া বারাসত স্কুলে গমন করেন। সেখানে প্রায় দেড় বৎসরকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বারাসত কলিকাতা হইতে বেশী দূরে নয়; সুতরাং লাহিড়ী মহাশয় সেখান হইতে আসিয়া সর্ব্বদাই সহরে বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় শিক্ষকতা সূত্রে স্বল্পকালের জন্যও যেখানে বাস করিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার স্মৃতি রাখিয়া আসিয়াছেন। সে সময়ে বারাসত স্কুলে যাঁহারা তাঁহার নিকটে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এখনও ভক্তিতে গদ গদ হইয়া তাঁহার দৈনিক জীবনের বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহার চরিত্রে তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণতার আদর্শ দেখিয়াছিলেন। শিক্ষকতা কার্য্যে এরূপ দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া কেহ কখনও দেখে নাই; ঘড়ির কাঁটাটীর ন্যায় যথাসময়ে তাঁহাকে নিজ কর্ম্মস্থানে দেখা যাইত; তৎপরে যে সময়ের যে কাজটী, তাহার প্রতি মুহূর্ত্তকালের অমনোযোগ হইত না। ছাত্রগণের হৃদয়ে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত করিবার জন্য, তাহাদের চরিত্র ও নীতি উন্নত করিবার জন্য, এবং সকল সাধু বিষয়ে তাহাদের উৎসাহ ও অনুরাগ বর্দ্ধিত করিবার জন্য, তাঁহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ দৃষ্ট হইত। যেমন তিনি একদিকে ছাত্রগণের মানসিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, তেমনি অপরদিকে নিজে মানসিক উন্নতির প্রতি যত্নবান ছিলেন। অবসরকালে দেখা যাইত হয় তিনি বাগানে বৃক্ষগণের পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত, না হয় পাঠে গভীররূপে নিমগ্ন। এই সময়ে উদ্ভিদ-বিদ্যা ও উদ্যান-রচনার প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি কতিপয় ছাত্রের সহিত স্কুলগৃহের নিকটস্থ ভূমিখণ্ড ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। নিজে কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি লইয়া ছাত্রদিগের এক জনকে এক একখণ্ড ভূমি দিয়াছিলেন। নিজে আপনার নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে শ্রমশীলতার দৃষ্টান্ত দেখাইতেন।

লাহিড়ী মহাশয় যখন বারাসতে প্রতিষ্ঠিত তখন ১৮৫৭ সালের মিউটিনীর

হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে গভর্ণমেণ্ট স্থির করেন যে সৈন্যবিভাগে এক প্রকার নূতন বন্দুক প্রচলিত করিবেন। ঐ বন্দুকের গুলিপূর্ণ টোটার উপরকার কাগজ দাঁত দিয়া কাটিয়া বন্দুকে পূরিতে হইত। সেই সকল টোটা দমদমের কারখানাতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। দমদম হইতে এই কথা উঠিল যে দুই প্রকার টোটা প্রস্তুত হইতেছে; এক প্রকার টোটার উপরকার কাগজ গো-বসার দ্বারা, অপর প্রকার টোটার কাগজ শূকর-বসার দ্বারা লিপ্ত করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছে; গো-বসা-লিপ্ত টোটা হিন্দুদিগকে ও শূকর-বসা-নির্ম্মিত টোটা মুসলমানদিগকে দেওয়া হইবে। প্রজাগণকে স্বধর্ম্মচ্যুত করা ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য। এই জনরবের কিছুমাত্র মূল ছিল না; এবং নূতন টোটা তখনও বাহির হয় নাই। অথচ এই জনরবে সিপাহীদিগের মন বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সিপাহীদিগের মধ্যে অযোধ্যা প্রদেশের অধিবাসী অনেক ছিল। তাহাদের মন লক্ষ্ণৌএর নবাবের পদচ্যুতি নিবন্ধন অগ্রেই উত্তেজিত ছিল। লর্ড ডালহউসি যে ভাবে অযোধ্যা রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাকে তৎপ্রদেশীয় প্রজাকুল জবরদস্তী ও বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অনুভব করিয়াছিল। অযোধ্যা প্রদেশবাসী সৈন্যদলের মনে সেই অসন্তোষ প্রধুমিত বহ্নির ন্যায় রহিয়াছিল। তাহার উপরে টোটা কাটার জনরব বাতাসের ন্যায় আসিল। ১৮৫৭ ফেব্রুয়ারি মাসে বারাকপুরে সিপাহীদিগের মধ্যে গভীর অসন্তোষের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়; কিন্তু সে অসন্তোষের গভীরতা কত কর্ত্তৃপক্ষ তখন তাহা ধরিতে পারিলেন না।

কিছুদিন পরে বারাকপুর হইতে একদল সৈন্য কোনও বিশেষ কারণে বহরমপুরে প্রেরিত হয়। তখন বহরমপুরে একদল সিপাহী সৈন্য ছিল। বারাকপুর হইতে নবাগত সিপাহীগণ তাহাদের কাণে কাণে নূতন টোটার কি বিবরণ বলিল তাহাতে সিপাহীরা একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সেখানে একদিন ইংরাজ-সৈন্যাধ্যক্ষদিগের সহিত সিপাহীদিগের মারামারি হইল। এই সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে লর্ড ক্যানিং ঐ সকল সিপাহীকে বারাকপুরে আনিয়া সকলের সমক্ষে তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তাহাদিগকে বারাকপুরে আনিয়া সমুদায় সিপাহী সৈন্যদলের সমক্ষে তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে সৈন্যদল হইতে বিদায় দেওয়া হইল। অন্য সময় হইলে এই শাস্তি দ্বারা অনিষ্টকর ফল না ফলিয়া ইষ্ট ফলই হইত। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ঘটিল। কর্ম্মচ্যুত সিপাহীদিগের মধ্যে অনেকে

অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশের লোক ছিল। তাহারা কর্ম্মচ্যুত হইয়া স্বীয় স্বীয় দেশে ফিরিবার সময় নূতন টোটার কথা লইয়া গেল। বিশেষতঃ তৎতৎস্থানের সিপাহীদিগের কর্ণে সেই কথা তুলিল; এবং কিরূপে তাহারা স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং সেজন্য নিগৃহীত হইয়াছে তাহাও গৌরব ও স্পর্দ্ধার সহিত প্রচার করিয়া দিল। চারিদিকে প্রধূমিত অগ্নির ন্যায় অসন্তোষ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল।

অবশেষে সেই প্রধূমিত অসন্তোষ ১০ই মে দিবসে মিরাট নগরে বিদ্রোহাগ্নির আকারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেখানে ৬ই মে দিবসে ৮৫ জন দেশীয় সৈনিক কাওয়াজের সময় টোটা লইতে অস্বীকৃত হওয়াতে তাহাদিগকে কোর্টমার্শ্যালের বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ইহাতে অপরাপর সিপাহিগণ তাহাদিগকে ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত বলিয়া, সদলে বিদ্রোহী হইয়া, ১০ই মে দিবসে জেলের কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দেয়; রাজকোষ লুণ্ঠন করে; অস্ত্রাগার হস্তগত করে; অনেক ইংরাজকে হত্যা করে; এবং অবশেষে দিল্লীর নাম-মাত্র সম্রাট বৃদ্ধ বাহাদুর সাকে পুনরায় রাজসিংহাসনে বসাইয়া স্বাধীনতার পতাকা উড়াইবার মানসে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে। তাহারা ১১ই মে দিল্লী অধিকার করে। এই সংবাদ দেশে প্রচার হইলে, যে যে স্থানে দেশীয় সিপাহী সৈন্য ছিল, সর্ব্বত্রই বিশেষ উত্তেজনা দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাজপুরুষগণ সতর্ক হইয়া বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন; ভয় ও মৈত্রী প্রভৃতির দ্বারা যতদূর হয় কিছুই করিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না। কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। যেমন গ্রীষ্মের দিনে ঘরে আগুন লাগিলে দেখিতে দেখিতে এক ঘর হইতে অপর এক ঘরে লাগিয়া যায়, সেই প্রকার দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহাগ্নি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

এই সুযোগ পাইয়া যাঁহাদের কোন না কোনও কারণে পূর্ব্বাবধি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল, এমন কতকগুলি লোক এই বিদ্রোহ-ব্যাপারের সারথ্যকার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন। তন্মধ্যে ফৈজাবাদের মৌলবী, বিঠুরের নানা সাহেব, ঝান্সীর রাণী ও নানার সেনাপতি তাঁতিয়া টোপী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ফৈজাবাদের মৌলবী একজন মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্য, লক্ষ্ণৌএর নবাবকে পদচ্যুত করাতে তিনি ইংরাজদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। নবাবের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার আলাপ ও আত্মীয়তা ছিল। তাঁহাদের অবনতিকে তিনি নিজধর্ম্মের

অধঃকরণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে বিদ্রোহীদলের একজন প্রধান উৎসাহ-দাতা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অযোধ্যার সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

নানাসাহেব মহারাষ্ট্রীয় প্রসিদ্ধ বাজীরাওর পোষ্যপুত্র। তিনি পেনসন প্রাপ্ত হইয়া একপ্রকার বন্দীদশাতে কানপুরের সন্নিকটবর্ত্তী বিঠুর নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কোন কোনও প্রার্থনা অগ্রাহ্য করাতে তিনি ইংরাজদিগের প্রতি চটিয়াছিলেন। তিনিও এই সুযোগ পাইয়া বিদ্রোহের অপর একজন সারথি হইলেন।

ঝান্সীর রাণীও ঐপ্রকার কোনও কারণে ইংরাজদিগের প্রতি চটিয়াছিলেন। তিনিও এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন। তাঁহার স্বাদশহিতৈষণা ও বীরত্ব দেখিয়া ইংরাজগণও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

কোন্ স্থানে কবে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিল তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিদ্রোহাগ্নি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এমন কি বম্বর, আরা প্রভৃতির ন্যায় বেহারের অন্তর্গত স্থান সকলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে কানপুরেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল। নানাসাহেবের প্ররোচনাতে বিদ্রোহী সিপাহিগণ উৎসাহিত হইয়া সেথানকার ইংরাজগণকে কয়েক দিন একটা বাড়ীতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে; তৎপরে তাহাদিগকে নৌকাযোগে অন্য স্থানে প্রেরণ করিবার আশা ও অভয় দিয়া তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া, নৌকাতে আরোহণ করাইয়া, তাহাদের অধিকাংশকে গুলি করিয়া হত্যা করে। অবশেষে যে সকল ইংরাজ রমণী ও বালক বালিকা থাকে তাহাদিগকে কিছুদিন অবরুদ্ধ রাখা হয়; কিন্তু প্রতিশোধের দিন নিকটে আসিতেছে দেখিয়া তাহাদিগকেও সদলে হত্যা করিয়া একটা কূপের মধ্যে তাহাদের মৃতদেহ নিক্ষেপ করে। এতদ্ব্যতীত ১২৬ জন ইংরাজ (যাহাদের অধিকাংশ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা ছিল) ফতেগড় হইতে নৌকাযোগে পলাইয়া আসিতেছিল, নানার আদেশে তাহাদিগকে নৌকা হইতে নামাইয়া হত্যা করা হয়। এই নিদারুণ হত্যা বিবরণ নানাসাহেবের নামের উপর অবিনশ্বর কলঙ্কের রেখার ন্যায় চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে। কারণ স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার হত্যা সকল দেশের সামরিক নীতির বিরুদ্ধ-কার্য্য।

১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে বিদ্রোহী সিপাহীগণ আসিতেছে, তাহারা কলিকাতা সহরের সমুদয় ইংরাজকে হত্যা করিবে এবং কলিকাতা সহর লুট করিবে। এই জনরবে কলিকাতার অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন; দেশীয় বিভাগেও লোকে কি হয় কি হয় বলিয়া ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিল। ইংরাজ ফিরিঙ্গী ও দেশীয় খ্রীষ্টানগণ সর্ব্বদা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্দুকের দোকানের পসার অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গেল। ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে অনেক অদ্ভুত পরামর্শ দিতে লাগিলেন,—কালাদের অস্ত্র শস্ত্র হরণ কর, কঠিন সামরিক আইন জারি কর, ইত্যাদি; ক্যানিং তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এজন্য ইংরাজেরা তাঁহার নাম Clemency Canning "দয়াময়ী ক্যানিং" রাখিলেন। আজ শোনা গেল দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের স্বাধীনতা হরণ করা হইবে; কালি কথা উঠিল, রাত্রি ৮টার পর যে মাঠের ধারে যায় তাহাকেই গুলি করে; সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত; একটী জিনিসের প্রয়োজন হইলে পাওয়া যাইত না; লোকে নিজ বাসাতে দুই চারিজনে বসিয়া অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে! কিছু অধিক রাত্রে গড়ের মাঠের সন্নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া আসিতে গেলেই পদে পদে অস্ত্রধারী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিত, "হুকুমদার" অর্থাৎ (Who comes there ?) তাহা হইলেই বলিতে হইত "রাইয়ত হ্যায়" অর্থাৎ আমি প্রজা, নতুবা ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িত। এইরূপে সকল শ্রেণীর মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্ক জন্মিয়া কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয় নাই।

যাহা হউক ইংরাজগণ সত্বর বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ পুনরায় তাঁহাদের হস্তগত হইল। প্রতিশোধের দিন যখন আসিল তখন তাঁহারাও নৃশংসতাচরণ করিতে ত্রুটী করিলেন না। ইংরাজসৈন্যগণ যতদূর অগ্রসর হইত, তাহাদের গমনপথের উভয় পার্শ্বে দোষী নির্দ্দোষী, হতাহত দেশীয় প্রজার মৃতদেহে আকীর্ণ হইতে লাগিল! এক এলাহাবাদে ৮০০ শত দেশীয় প্রজাকে ফাঁসি দেওয়া হইল!

ক্রমে সমগ্র দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮৫৮ সালে মহারাণী প্রজাদিগকে অভয়দান করিয়া ভারত সাম্রাজ্য নিজ হস্তে লইলেন; ষ্টেট-সেক্রেটারির পদ সৃষ্ট হইল; কলিকাতা সহর আলোকমালাতে মণ্ডিত হইল; চারিদিকে আনন্দধ্বনি উঠিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের

উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল; এক নবশক্তির সূচনা হইল; এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল। সে জন্যই ইহার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দিলাম।

বিদ্রোহজনিত উত্তেজনাকালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' নামক সাপ্তাহিক ইংরাজী কাগজ এক মহোপকার সাধন করিল। পেট্রিয়ট সারগর্ভ সুযুক্তি-পূর্ণ তেজস্বিনী ভাষাতে কর্ত্তৃপক্ষের মনে এই সংস্কার দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইলেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহ কেবল কুসংস্কারাপন্ন সিপাহিগণের কার্য্য মাত্র, দেশের প্রজাবর্গের তাহার সহিত যোগ নাই। প্রজাকুল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত, এবং তাহাদের রাজভক্তি অবিচলিত রহিয়াছে। পেট্রিয়টের চেষ্টাতে লর্ড ক্যানিংএর মনেও এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল; সেজন্য এদেশীয়দিগের প্রতি কঠিন শাসন বিস্তার করিবার জন্য ইংরাজগণ যে কিছু পরামর্শ দিতে লাগিলেন, ক্যানিং তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই কারণে তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহার Clemency Canning বা "দয়াময়ী ক্যানিং" নাম দিল। এমন কি তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া লইবার জন্য ইংলণ্ডের প্রভুদিগকে অনেকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। পার্লেমেণ্টেও সে কথা উঠিয়াছিল; কিন্তু ক্যানিংএর বন্ধুগণ পেট্রিয়টের উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে এদেশবাসিগণ ক্যানিংএর প্রতি কিরূপ অনুরক্ত, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞ। পেট্রিয়ট এই সময়ে এদেশীয়দিগের অদ্বিতীয় মুখপাত্র হইয়া উঠিল। হরিশ্চন্দ্র একদিকে যেমন গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার বৈধ শাসনকে সমর্থন করিতেন, তেমনি অপরদিকে ইংরাজ-গণের সর্ব্বপ্রকার অবৈধ আচরণের প্রতিবাদ করিতেন। সকলে উত্তে-জনাতে পড়িয়া স্থিরবুদ্ধি হারাইয়াছিল, কেবল পেট্রিয়ট হারায় নাই; এজন্য রাজপুরুষগণের নিকট ইহার আদর বাড়িয়া গেল। এরূপ শুনিয়াছি পেট্রিয়ট বাহির হইবার দিন লর্ড ক্যানিংএর ভৃত্য আসিয়া পেট্রিয়ট আফিসে বসিয়া থাকিত, প্রথম কয়েকখানি কাগজ মুদ্রিত হইলেই লইয়া যাইত। হিন্দু পেট্রিয়টের এই প্রভাব দেখিয়া দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পুলকিত হইয়া উঠিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশনের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি নব্যবঙ্গের নেতৃগণ হরিশের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনচরিত বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে চির-স্মরণীয়। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান নিরবচ্ছিন্ন আত্ম চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা কতদূর উন্নতি করিতে পারে, হরিশ তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ১৮২৪ সালে, কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্ত্তী ভবানীপুর নামক স্থানে, স্বীয় মাতামহের ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামধন মুখোপাধ্যায় রাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে কুলমর্য্যাদাতে অগ্রগণ্য ছিলেন। কুলপ্রথা অনুসারে তিনি তিনটী বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হরিশ সর্ব্বকনিষ্ঠা পত্নী রুক্মিণী দেবীর গর্ভজাত। হরিশের জ্যেষ্ঠ এক সহোদর ছিলেন তাঁহার নাম হারাণ চন্দ্র। শৈশবাবধি হরিশ ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিতে অভ্যস্ত হন। কিছুকাল কোনও পাঠশালে পড়িবার পর তিনি অবৈতনিক ছাত্ররূপে ইউনিয়ান স্কুল নামক একটী স্কুলে প্রেরিত হন। এখানে ছয় বৎসর পাঠ করিয়া ১৪ কি ১৫ বৎসরের সময় দারিদ্র্যের তাড়নায় পাঠ সাঙ্গ করেন। সেই বয়সেই তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাতে বিব্রত হইতে হয়। কর্ম্ম কি সহজে জোটে? বালক হরিশ উমেদারী করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দশ টাকা বেতনের একটী সামান্য চাকুরী জুটিল। কিছুদিন তাহা করিয়া বেতনবৃদ্ধির আশা না দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে আরও কিছুকাল দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করার পর, মিলিটারি অডিটার জেনেরালের আফিসে ২৫৲ টাকা মাসিক বেতনের এক কর্ম্ম পাইলেন। এই কর্ম্মটী তাঁহার সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল কারণ হইল। তিনি অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা হইতে একটু নিষ্কৃতি পাইয়াই আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত আপনার জ্ঞানোন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন। কিনিয়া ও ভিক্ষা করিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি হইলেই কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর চাঁদাদায়ী সভ্য হইয়া, সেখানে গিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন আফিসের ছুটীর পর লাইব্রেরিতে গিয়া বসিতেন ও সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ইংরাজী সংবাদপত্র ও পত্রিকাদি পাঠ করিতেন; তদ্ভিন্ন রাশি রাশি গ্রন্থ বাড়ীতে আনিয়া রাত্রে পাঠ করিতেন। এই

রূপ শোনা যায়, এই সময়ে পাঁচ মাস কালের মধ্যে ৫৭ খানি বাঙ্কাই এডিনবরা রিভিউ, দুই তিন বার পড়িয়া হৃদ্গত করিয়াছিলেন।

হরিশ একদিকে যেমন পড়িতেন, অপরদিকে তৎকাল প্রচলিত ইংরাজী সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে লিখিতেন। সে সময়ে হিন্দুকালেজের পূর্ব্বতন ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ Hindu Intelligencer নামে, এক ইংরাজী কাগজ সম্পাদন করিতেন, তাহাতে হরিশের লিখিত প্রবন্ধাদি সর্ব্বদা বাহির হইত। এই লেখার জন্য শিক্ষিত দলে তিনি সুপরিচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ২৫৲ টাকার কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া তাঁহার বেতন ৪০০৲ চারি শত টাকা হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮৫২ সালে হরিশের মান সম্ভ্রম এমন হইয়াছিল যে অপরাপর সভ্যগণের আগ্রহে এই সালে তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যপদে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করিয়াই তিনি আইন, আদালত, রাজনীতি প্রভৃতির মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য এমনি মনোনিবেশ করিলেন যে, ত্বরায় তিনি ঐ এসোসিএশনের পরামর্শদাতৃগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। একদিকে যেমন রাজনীতি সম্বন্ধে দেশের সর্ব্ববিধ হিতকর বিষয়ে তিনি পরামর্শদাতা ও সহায় হইলেন, তেমনি অপরদিকে কতিপয় বন্ধুর সহিত সমবেত হইয়া তাঁহার বাসভূমি ভবানীপুরে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। তিনি ঐ সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য ও সম্পাদক ছিলেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে ইংরাজী বক্তৃতার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। এই সময়ে তাঁহার প্রদত্ত কতকগুলি বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়াছে।

এই সকল দেশহিতকর কার্য্যের মধ্যে অনুমান ১৮৫৩ সালে মধুসূদন রায় নামক একজন স্বদেশ-হিতৈষী ধনী ব্যক্তি একটী মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া একখানি সাপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদপত্র বাহির করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তিনিই "হিন্দু পেট্রিয়ট" বাহির করিয়া কিছুদিন অপরের দ্বারা চালাইয়া পরে হরিশ চন্দ্রকে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। হরিশ মনের মত একটা কাজ পাইয়া ঐ পত্রিকা সম্পাদনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন। কিন্তু তখন ইংরাজী সংবাদপত্র পড়িবার লোক অল্পই ছিল; সুতরাং অনেক চেষ্টা করিয়াও হিন্দু পেট্রিয়টের গ্রাহক এক শতের অধিক হইল না। এই অবস্থাতে কিছুদিন পেট্রিয়ট চালাইয়া মধুসূদন রায় নিজপ্রেস অপরকে বিক্রয় করিয়া "পেট্রিয়ট" হরিশ চন্দ্রকে দিয়া পশ্চিম যাত্রা করিলেন।

হরিশ কাগজ ভবানীপুরে তুলিয়া লইয়া গেলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার ভ্রাতা হারাণ চন্দ্রকে নামতঃ প্রেস ও কাগজের সত্বাধিকারী করিয়া উৎসাহ-সহকারে কাগজ চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার গুণে পেট্রিয়ট কিরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে পেট্রিয়টের শক্তি অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল।

হরিশের যে লেখনী লর্ড ডালহউসির অযোধ্যাধিকারের সময়ে অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছিল, তাহাই মিউটিনীর সময়ে ক্যানিংএর পৃষ্ঠপোষক হইয়া শান্তিস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই লেখনী আবার নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। নীলকর-অত্যাচার-নিবারণ হরিশের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। এই কার্য্যে তিনি দেহ, মন, অর্থ, সামর্থ্য সকলি নিয়োগ করিয়াছিলেন। নীলকর হাঙ্গামার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই :—

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই যশোহর, নদীয়া, পাবনা প্রভৃতি নানা জেলাতে নীলের চাষ আরম্ভ হয়। ইংরাজগণ কোম্পানি করিয়া নীলের চাষ আরম্ভ করেন। অল্প ব্যয়ে অধিক লাভ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল; সুতরাং তাঁহারা তাহার নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দাদন দেওয়া একটী প্রধান। দাদনের অর্থ কৃষীদিগকে অগ্রিম অর্থ দেওয়া। দরিদ্র কৃষকগণ অগ্রিম অর্থ পাইলে আরও অনেক কাজে লাগাইতে পারিবে বলিয়া দাদন হইত; এবং ভাল ভাল জমিতে নীল বুনিবে এবং অপরাপর প্রকারে নীলকরদিগের সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত থাকিত। তৎপরে তাহারা নীলকরদিগের দাসরূপে পরিণত হইত। নীলকরগণ জোর করিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে নীল বুনাইয়া লইতেন; বলপূর্ব্বক তাহাদিগের গোলাঙ্গলাদি ব্যবহার করিতেন; তাঁহাদের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে না চাহিলে প্রহার, কয়েদ, গৃহদাহ প্রভৃতি নৃশংস অত্যাচার করিতেন; এবং অনেক স্থলে জমিদার হইয়া বসিয়া অবাধ্য প্রজাদিগকে একেবারে ধনে প্রাণে সারা করিতেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সকল অত্যাচার এতই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট উপদ্রব নিবারণের উদ্দেশে নূতন আইন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাহাতে বিবাদ আরও পাকিয়া গেল। অবশেষে অনুমান ১৮৫৮ কি ৫৯ সালে লক্ষ লক্ষ প্রজা ধর্ম্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল যে নীলের দাদন লইবে না, বা নীলের চাষ করিবে না। তখন নীলকর

ইংরাজগণ তাঁহাদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিলেন। যশোর, নদীয়া প্রভৃতি জেলার জমিদারগণের ও প্রজাগণের সহিত নীলকরদিগের ঘোর বিবাদ বাঁধিয়া গেল। অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জেলার মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি নীলকরদিগের স্বজাতীয়, সুতরাং প্রজারা প্রায়ই সুবিচার লাভ করিত না। কিন্তু তাহারা ইহাতেও দমিত না; অনেকে ধনে প্রাণে সারা হইয়া যাইত, তবু নিরস্ত হইত না। এই সময়ে হরিশচন্দ্র অত্যাচরিত প্রজাবৃন্দের পক্ষ হইয়া লেখনী ধারণ করিলেন। অবশেষে প্রধানতং তাঁহারই চেষ্টাতে গবর্ণমেণ্ট এই ১৮৬০ সালেই "ইণ্ডিগো কমিশন" নামে এক কমিশন নিযুক্ত করিলেন। তাহার সভ্যগণ জেলায় জেলায় ঘুরিয়া নীলের অত্যাচার বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হরিশ কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। চারিদিক হইতে নীলকরদিগের উপরে ছি ছি রব উঠিল। নীলকরগণ জাতক্রোধ হইয়া আর্কিবল্ড হিল্‌স নামক একজন নীলকরকে খাড়া করিয়া পেট্রিয়টের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে ফৌজদারি মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইল। ভবানীপুর সুপ্রিম কোর্টের এলাকাভুক্ত নয় বলিয়া সে মোকদ্দমা উঠিয়া গেল। কিন্তু এই সকল গোলমালে হরিশের ভগ্ন শরীরে আর সহিল না। ১৮৬১ সালের জুন মাসে ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি এলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মানুষের দেহে আর কত সয়! সে সময়ে যাঁহারা হরিশের দুরন্ত পরিশ্রম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে রাত্রির কয়েক ঘণ্টা কাল ব্যতীত হরিশের আর বিশ্রাম ছিল না। একে "পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদকতা কাজ, সেজন্য তাঁহাকে রাশি রাশি সংবাদপত্র পড়িতে হইত, ও প্রবন্ধাদি লিখিতে হইত, তদুপরি দিবারাত্রি নীলকরপ্রপীড়িত প্রজাবৃন্দের সমাগম। তাঁহার ভবন সর্ব্বদা লোকারণ্য থাকিত। কাহারও দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইতেছে, কাহাকেও উকিলের নিকট সুপারিস চিঠী দিতে হইতেছে, কাহারও মোকদ্দমার হাল শুনিতে হইতেছে; বিশ্রাম নাই। অনেক দিন আফিস হইতে ফিরিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আর আফিসের পোষাক বদলাইবার সময় পাইতেন না। আফিসের কলম ছাড়িয়া আসিয়া আবার কলম ধরিয়া বসিয়া যাইতেন। তাঁহার জননী এই গুরুতর শ্রমের প্রতিবাদ করিয়া টিক্ টিক্ করিতেন। বলিতেন "ওরে মানুষের শরীরে এত শ্রম সবে না, ওরে মারা পড়্‌বি, ওরে কলম

রাখ্।" তদুত্তরে তিনি বলিতেন—"মা, তোমার সব কথা শুনবো, কিন্তু এই গরীব প্রজাদের জন্যে যা করছি তাতে বাধা দিও না, ওরা ধনে প্রাণে সারা হলো, এ কাজ না করে আমি ঘুমাতে পারবো না।" কিন্তু এই অতিরিক্ত শ্রমের ফল এই হইত যে, যে পেটিুয়টের কাজ সপ্তাহ ধরিয়া করিলে অপেক্ষাকৃত লঘু হইত, তাহা দুই দিনে সারিতে হইত, সুতরাং সে দুই দিন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হইত। এই গুরুতর শ্রমে দেহ মন যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িত, তখন শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের তদানীন্তন প্রথানুসারে সুরা-বিষ পান করিয়া আপনার অবসন্ন দেহ মনকে সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

এরূপ শুনিয়াছি যে ইহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। সেই শোকের অবস্থাতে তাঁহার নবপরিচিত ধনী বন্ধুগণ তাঁহাকে সুরাপান ও অন্যান্য নিন্দিত আমোদে লিপ্ত করিয়া তাঁহার শোকাপনোদনের চেষ্টা পান। তাহা হইতেই তাঁহার সর্ব্বজনপ্রশংসিত চরিত্রে কালির রেখা পড়ে; তাহা হইতেই তাঁহার পানাসক্তি প্রবল হয়। এই বিবরণ যখন শুনি, তখন চক্ষে জল আসে আর বলি—হায়! স্কচ কবি বরন্‌স্ লাঙ্গল ফেলিয়া যদি এডিনবরা নগরে না আসিতেন তাহা হইলে যেমন ভাল হইত, তেমনি আমাদের দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান হরিশের পদবৃদ্ধি যদি না হইত, তিনি যদি কলিকাতায় ধনীদের আদুরে ছেলে হইয়া না দাঁড়াইতেন, তবে বুঝি ভাল হইত। ধনীরা কয়েকদিনের জন্য তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া নাচিয়া গেলেন, দিয়া গেলেন মদের বোতল ও দারুণ পীড়া। ক্ষতি যাহা হইবার হরিশের পরিবারবর্গের হইল; এবং সর্ব্বোপরি হতভাগিনী বঙ্গভূমির হইল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় এমন বিমল হৃদয়ে, দেহ মন প্রাণ দিয়া, স্বদেশের সেবা অতি অল্প লোকেই করিয়াছে।

না জানি নীলকরগণ কি জাতক্রোধই হইয়াছিলেন! হরিশের মৃত্যুর পরেও তাঁহাদের ক্রোধ থামিল না। যে আর্কিবল্‌ড হিল্‌স্ তাঁহার নামে প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তিনিই তদনন্তর তাঁহার বিধবা পত্নীকে প্রতিবাদীশ্রেণীগণ্য করিয়া আলিপুর কোর্টে দশ হাজার টাকার দাবী করিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমা চালাইতে অগ্রসর হইলেন। হিল্‌সের পশ্চাতে নীলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল না। এদেশীয়দিগের মধ্যে সে একতা কোথায়? কাজেই বন্ধুদিগের পরামর্শে হরিশের বিধবাকে আপসে মিটাইতে হইল। কিন্তু তথাপি বাদীর খরচার হিসাবে এক হাজার টাকা দিবার জন্য অঙ্গীকার করিতে হইল। এই এক

হাজার টাকা অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়া বিধবার বসতবাটী-খানি ক্রোক হইতে উদ্ধার করিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক এক দিকে যখন ইণ্ডিগো কমিশন, ও পেট্রিয়টের সহিত বিবাদ প্রভৃতির উপক্রম, তখন অপর দিকে ১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে দীনবন্ধু মিত্রের সুবিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হইল। এই আর এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল। কোন গ্রন্থ বিশেষে যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। "নীলদর্পণ" কে লিখিল, তাহা জানিতে পারা গেল না; কিন্তু বাসাতে বাসাতে "ময়রাণী লো সই নীল গেজেছ কই?" ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল। যতদূর স্মরণ হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। পাদরী জেম্‌স লং সাহেব তাহা নিজের নামে প্রকাশ করিলেন। ইংলণ্ডেও আন্দোলন উপস্থিত হইল। নীলকরগণ আসল গ্রন্থকারকে না পাইয়া ইংলিসমান পত্রিকার সম্পাদককে মুখপাত্র করিয়া ১৮৬১ সালের ১৯ শে জুলাই লংএর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

এরূপ মোকদ্দমা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। লং বিধিমতে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে তিনি বিদ্বেষবুদ্ধিতে কোনও কার্য্য করেন নাই। তিনি বহুবর্ষ হইতে দেশীয় সংবাদপত্রের ও ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির ভাব গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া আসিতেছিলেন। নীলদর্পণের অনুবাদ সেই কার্য্যেরই অঙ্গস্বরূপ। কিন্তু তদানীন্তন ইংরাজ-পক্ষপাতী জজ সার মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স্ সে কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার বিচারে লংএর এক মাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা জরিমানা হইল। তখন নীলকর বিদ্বেষ এদেশীয়দিগের মনে এমন প্রবল যে জরিমানার হুকুম হইবামাত্র, মহাভারতের অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়, জরিমানার হাজার টাকা গুণিয়া দিলেন। এরূপ শুনিয়াছি যে আরও অনেক দেশীয় ভদ্রলোক আদালতে জরিমানার টাকা দিবার জন্য টাকা লইয়া উপস্থিত ছিলেন।

বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার

প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটীই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল, প্রত্যেকটীরই ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে আলোচনার যোগ্য।

নীলদর্পণ নাটকের যে এত আদর হইয়াছিল, তাহার একটা কারণ এই ছিল যে, সে সময়ে বঙ্গসমাজে নাট্যকাব্যের নব-অভ্যুদয় ও রঙ্গালয়ের আবির্ভাব নিবন্ধন লোকের মনে এক প্রকার উত্তেজনা চলিতেছিল। বঙ্গদেশে নাট্যকাব্যের অভ্যুদয় একটা বিশেষ ঘটনা। তৎপূর্ব্বে যাত্রা, কবি, হাপ আকড়াই প্রভৃতি লোকের আমোদপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার একমাত্র উপায় ছিল। অধিকাংশ স্থলে এই যাত্রা, কবি ও হাপ আকড়াই অভদ্র ও অশ্লীল বিষয়ে পূর্ণ থাকিত। ইংরাজী শিক্ষা দেশমধ্যে যেমন ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সকলের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। অনেকে যাত্রা কবি প্রভৃতিতে উপস্থিত থাকিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। তখন বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া সুরাপান, ও হাস্য পরিহাস প্রভৃতি করাই তাঁহাদের একমাত্র সামাজিক আমোদ অবশিষ্ট রহিল। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে ইংরাজগণের স্থাপিত রঙ্গালয়ে গিয়া অভিনয় দর্শন করিতেন। সে সময়ে (১৮৫৬। ৫৭ সালে) সহরে ইংরাজদের একটী প্রসিদ্ধ রঙ্গালয় ছিল, তাহাতে দেশের অনেক শিক্ষিত লোক ও বড়লোক অভিনয় দেখিতে যাইতেন। দেখিয়া আসিয়া আমাদের মধ্যে এরূপ রঙ্গালয় নাই কেন বলিয়া ক্ষোভ করিতেন। তাহার ফলস্বরূপ সহরের দুই একজন বড়লোক উদ্যোগী হইয়া ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে অভিনেতা করিয়া ইংরাজী নাটক অভিনয় করিয়া বন্ধুবান্ধবের চিত্ত-বিনোদন করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। এ চেষ্টা তখন সম্পূর্ণ নূতন ছিল না। ইহার অনেক কাল পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় একবার নিজের হুঁড়োর বাগানে এইচ, এইচ, উইলসন সাহেবের অনুবাদিত উত্তররামচরিত অভিনয় করিয়া বন্ধুবান্ধবকে দেখাইয়াছিলেন।

দেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে ইংরাজী অভিনয়ের আদর দেখিয়া ১৮৫৪ সালে ইংরাজদিগের রঙ্গালয়ের লোকেরা উদ্যোগী হইয়া ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ভবনে "ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার" নামে এক শাখা রঙ্গালয় স্থাপন পূর্ব্বক সেক্‌সপীয়রের নাটক সকলের অভিনয় আরম্ভ করিলেন। তাহাতে দেশীয়

শিক্ষিত সমাজে ইংরাজী অভিনয়ের ধূম লাগিয়া গেল। রঙ্গালয়ের অভিনয় একটা বাতিকের মধ্যে দাঁড়াইল। স্কুলের ছেলে ছোকরারা স্বীয় স্বীয় দলে ছোট ছোট রকমে ম্যাকবেথ প্রভৃতির অভিনয় আরম্ভ করিল। কিন্তু ক্রমে ধনিগণ অনুভব করিলেন যে ইংরাজী নাটক অভিনয় করিলে সাধারণের প্রীতিকর হয় না। এই জন্য বাঙ্গালা নাটকের অভিনয়ের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। এই সময়ে সংস্কৃত কালেজের অন্যতম অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় কোনও ধনি-প্রদত্ত পারিতোষিক লাভের উদ্দেশে "কুলীনকুল সর্ব্বস্ব" নামক এক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের প্ররোচনায় ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে একবার তাহার অভিনয় হয়। ইহাতেই দেশীয় নাটক অভিনয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। তৎপরে ১৮৫৭ সালে সিমুলীয়ার বিখ্যাত ধনী অশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) উদ্যোগী হইয়া শকুন্তলাকে বাঙ্গালা নাটকাকারে পরিণত করিয়া অভিনয় করাইলেন। তৎপরেই মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় নিজ ভবনে বেণীসংহার নাটকের অভিনয় করাইলেন; এবং কিছু দিন পরে মহাসমারোহে তাঁহার নিজের অনুবাদিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অভিনয় হইল। দেখিতে দেখিতে সহরে বাঙ্গালা নাটক অভিনয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া গেল।

এই সকল অভিনয় দেখিয়া পাইকপাড়ার রাজপরিবারের দুই ভাই, রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের এবং (মহারাজ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মনে একটী দেশীয় রঙ্গালয় স্থাপনের সংকল্প জন্মিল। তাঁহারা তিন জনে পরামর্শ করিয়া বেলগাছিয়া নামক উদ্যানে এক নাট্যালয় স্থাপন করিলেন। এই নাট্যালয় বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনিয়া দিবার পক্ষে উপায়-স্বরূপ হইল। ইহা অমর কবি মধুসূদনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ১৮৫৬ সালে মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তদানীন্তন কলিকাতার পুলিস কোর্টে কাজ করিতেছিলেন। কলিকাতার লোক তাঁহাকে চিনিত না। কেবল হিন্দুকালেজের কতিপয় সহাধ্যায়ী মাত্র তাঁহাকে চিনিতেন। বাবু গৌরদাস বসাক তাঁহাদের মধ্যে একজন। গৌরদাস বাবু তাঁহাকে নূতন নাট্যালয়ের উদ্যোগী ধনীদের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। তাঁহারা ঐ নাট্যালয়ে ১৮৫৮ সালে সংস্কৃত রত্নাবলী নাটকের অনুবাদ করিয়া অভিনয় করিলেন। মধুসূদন তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া দিলেন। সেই ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়াই মধুসূদনের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি রাজাদের নিরতিশয়

মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কে, সি, এস্, আই।

(২২৬ পৃষ্ঠা)

শ্রদ্ধা জন্মিল। মধুসূদন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়মবদ্ধ রীতি ত্যাগ পূর্ব্বক নূতন প্রণালীতে "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক রচনা করিলেন। তাহা সকলের হৃদয়-গ্রাহী হইল। মধুসূদনের প্রতিভার বিমল রশ্মি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশকে অপূর্ব্বরাগে অনুরঞ্জিত করিল। তাঁহার পদ্মাবতী, বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি অপরাপর নাটক ক্রমে প্রণীত ও অভিনীত হইতে লাগিল।

তাঁহার জীবনচরিতকার বলেন যে এই বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ের সম্পর্ক হইতেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার সূত্রপাত। তিনি নিজের প্রণীত কোন কোনও নাটকে ইংরাজ কবিদিগের অনুকরণে নায়ক-নায়িকার উক্তি প্রত্যুক্তিমধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পাঠ করেন। এই বিষয় লইয়া উক্ত ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হয়। ঠাকুর মহাশয় বলেন যে ফরাসি ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকূল নহে। মধুসূদন প্রতিবাদ করিয়া বলেন—"বাঙ্গালা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষার কন্যা, তাহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়, বাঙ্গালাতে কেন হইবে না? আমি অমিত্রাক্ষরে কাব্য রচনা করিয়া দেখাইব।" এই বলিয়া তিনি "তিলোত্তমা" রচনা করিতে বসেন; এবং অল্পকাল মধ্যেই তাহার কিয়দংশ লিখিয়া বন্ধুগণের হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৬০ সালে "তিলোত্তমা-সম্ভব" কাব্যের কিয়দংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহার পরে তিন বৎসরের মধ্যেই মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভা দেখিতে দেখিতে প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় উঠিয়া যেন মাধ্যাহ্নিক রেখাকে অতিক্রম করিয়া গেল! তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও মেঘনাদবধ প্রভৃতি প্রকাশিত হইলে তাঁহার কবিত্বখ্যাতি দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইল।

বঙ্গসাহিত্য আকাশে মধুসূদন যখন উদিত হইলেন, তখনও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভার স্নিগ্ধ জ্যোতি তাহা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কোথায় আমরা গুপ্ত কবির রসিকতা ও চিত্তরঞ্জক ভাব সকলের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আর কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধক্ ধক্ করিয়া কি প্রচণ্ড দীপ্তি উদিত হইল। বঙ্গসাহিত্যে সেই অপূর্ব্ব প্রদোষকালের কথা আমরা কখনই বিস্মৃত হইব না। সংস্কৃত কবি এক স্থানে বলিয়াছেন :—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোর্কঃ।

একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, অপরদিকে অরুণকে অগ্রসর করিয়া দিবাকর দেখা দিতেছেন।

বঙ্গসাহিত্যজগতে যেন সেই প্রকার দশা ঘটিল! ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার কমনীয় কান্তির মধ্যে মধুসূদনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিয়া পড়িল। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন। মধুসূদনের গ্রন্থাবলী যখন প্রকাশিত হইল, তখন বঙ্গসমাজে মহা আলোচনা উপস্থিত হইল। বঙ্গীয় পাঠকগণ মধুসূদনের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দল "প্রদানিয়া", "সান্তনিয়া" প্রভৃতি পদকে বাঙ্গালা ভাষার যথেচ্ছাচার বলিয়া উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন; এবং মধুসূদনের অনুসরণে কাব্য রচনা করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার প্রমাণ স্বরূপ "ছুঁছুন্দরীবধ কাব্যের" উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাঁহারা ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে চান, তাঁহারা পণ্ডিতপ্রবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' উক্ত কাব্য হইতে উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া দেখিবেন। এক পক্ষ এক দিকে যখন এইরূপ বিরোধী, অপর পক্ষ অপরদিকে তেমনি গোঁড়া। স্কুল ও কালেজের উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশ বালক এই গোঁড়ার দলে প্রবেশ করিল। নব-প্রণীত অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিরূপে ছন্দ ও যতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পড়িতে হইবে, তাহা সকলে বুঝিতে পারিত না দুই একজন অগ্রসর চালাক ছেলে মধুসূদনের নিজের মুখে শুনিয়া আসিয়াছে বলিয়া আসিয়া আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইত। এক জন পড়িত বিশ জনে শুনিত। আমরা ঐ চালাক ছেলেদিগকে খুব বাহাদুর মনে করিতাম। এইরূপে ইংরাজ কবি কাউপার যেমন পোপ ও ড্রাইডেনের ছন্দ-নিগড়ে দৃঢ়বদ্ধ ইংরাজী কাব্যে স্বাধীনতা ও ওজস্বিতা প্রবিষ্ট করিয়া নবজীবন আনয়ন পক্ষে উপায়স্বরূপ হইয়াছিলেন, তেমনি মধুসূদনের অলৌকিক প্রতিভা ভারতচন্দ্র ও গুপ্ত কবির রচিত ছন্দ-নিগড় হইতে বঙ্গীয় কাব্যকে উদ্ধার করিয়া তাহাতে ওজস্বিতা ঢালিয়া নবজীবনের সঞ্চার করিল! মধুসূদন প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিজ প্রতিভাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, মিত্রাক্ষর ছন্দ রচনাতে তিনি কম নিপুণ ছিলেন। তাঁহার রচিত ব্রজাঙ্গনা কাব্য তাহার প্রমাণ। ইহাতে তিনি মিত্রাক্ষরে সরস সুমিষ্ট কবিতাতে মধু ঢালিয়া রাখিয়াছেন।

অগ্রে যে কবিদ্বয়ের কথা বলা গেল তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উল্লেখ করা যাইতেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

সুখের বিষয়ে এত দিনের পর ইঁহার সমস্ত গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ইঁহার বিশ্বাসযোগ্য জীবনচরিত পাওয়া যাইতেছে। ইনি কাঁচড়াপাড়ার বৈদ্যবংশীয় হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। বাঙ্গালা ১২১৮ সালের ফাল্গুন মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি স্বীয় কুল ক্রমাগত চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বগ্রামের নিকটবর্ত্তী এক কুঠীতে ৮৲ টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম করিতেন। কলিকাতা যোড়াসাঁকোতে ঈশ্বর চন্দ্রের মাতামহের আলয়। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরী করিতেন। তাঁহার অবস্থাও তাদৃশ ভাল ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। মাতৃবিয়োগের পর তিনি মাতামহের আলয়ে আসিয়া অধিকাংশ সময় থাকিতেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি তৎকালে পড়াশুনাতে বড় অনাবিষ্ট ছিলেন। পাঠশালে যাইতেন বটে, কিন্তু পড়াশুনা অপেক্ষা খেলা ও দুষ্টামিতে বেশি মনোযোগী ছিলেন। বলিতে গেলে শিক্ষা যাহাকে বলে ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কিছুই পান নাই। ইংরাজী শিক্ষা ত হইলই না; বাঙ্গালাও নিজে পড়িয়া যাহা শিখিলেন তাহাই একমাত্র সম্বল হইল। কিন্তু এই সম্বল লইয়াই তিনি অচিরকালের মধ্যে বাঙ্গালার সুকবি ও সুলেখক রূপে পরিচিত হইলেন।

যৌবনের প্রারম্ভে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা জন্মে। তাঁহাদেরই ভবনে তিনি অবসরকাল যাপন করিতেন। তাঁহাদেরই আশ্রয়ে, তাঁহাদেরই উৎসাহে, তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। তিনি অনেক সময় মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতেন; সখের কবির দলে গান বাঁধিতেন; বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটিলে কবিতা রচনা করিয়া সকলের চিত্তবিনোদন করিতেন। এই যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের প্ররোচনাতে, তাঁহারই সাহায্যে, বাঙ্গালা ১২৩৭ সালে, বা ইংরাজী ১৮৩০ সালে "সংবাদ-প্রভাকর" সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। সাপ্তাহিক প্রভাকর, প্রধানতঃ ইঁহার পদ্যময় প্রবন্ধ সকলের গুণে, সত্বর

লোকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। দেখিতে দেখিতে ইহার গ্রাহক ও লেখক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরচন্দ্র দেশের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্তের উৎসাহ-দাতাদিগের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। অক্ষয়বাবু ইংরাজী পত্রিকাদি হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রই তাঁহাকে তত্ত্ববোধিনী সভায় সভ্য হইতে প্ররোচনা করেন; এবং তিনিই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন। বলিতে গেলে উত্তরকালে অক্ষয়কুমার দত্ত যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন। কেবল তত্ত্ববোধিনী সভা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তৎকালের অনেক সভা সমিতির সহিত সংযুক্ত ছিলেন; এবং বক্তৃতাদি করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেন।

তৎপরে ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাল হওয়াতে "প্রভাকর" কিছুকালের জন্য উঠিয়া যায়। কিন্তু ঐ সালেই আন্দুলের জমীদার জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের উদ্যোগে "রত্নাবলী" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মহেশচন্দ্র পাল নামক এক ব্যক্তি নামতঃ তাহার সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু লিপিকার্য্যে তাঁহার পারদর্শিতা না থাকাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কেই সম্পা-দকতা কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতে হইত। কিন্তু একার্য্যে তিনি অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। কিছুদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্যের হানি নিবন্ধন সকল কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া কটকে তাঁহার পিতৃব্য শ্যামামোহন রায় মহাশয়ের আবাসে গিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করেন। সেখানে একজন দণ্ডীর নিকট তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহা বাঙ্গালা কবিতাতে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালা ১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আবার প্রভাকরকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তখন প্রভাকর সপ্তাহে তিন বার প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৪৫ সালের আষাঢ় মাস হইতে তাহা দৈনিকরূপে পরিণত হয়। এইবারে ঈশ্বরচন্দ্র অনেক পণ্ডিত ও সুলেখক ব্যক্তিকে স্বীয় কার্য্যের সহায়তার জন্য ব্রতী করিলেন। তন্মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার চাঙ্গড়িপোতা গ্রামনিবাসী হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি "সোমপ্রকাশের" জন্মদাতা খ্যাতনামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পিতা ও আমার মাতামহ।

এখন হইতে "প্রভাকর" উদীয়মান রবির ন্যায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন

হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রভাকরের কবিতা পড়িবার জন্য বাঙ্গালা দেশের লোক পাগল হইয়া উঠিল। প্রভাকর বাহির হইলে বিক্রেতৃগণ রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া ঐ সকল কবিতা পাঠ করিত এবং দেখিতে দেখিতে কত কাগজ বিক্রয় হইয়া যাইত! ক্রমে দেশে ঈশ্বরচন্দ্রী কবিদল দেখা দিল; এবং বঙ্গ-সাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত হইল। এখন যেমন ছোট বড়, পুরুষ স্ত্রীলোক যিনি কবিতা রচনা করেন তিনিই রবীন্দ্রনাথের ছাঁচে ঢালিয়া থাকেন, তখন কবিতা রচনার জন্য যে কেহ লেখনী ধারণ করিতেন তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাঁচে ঢালিতেন। দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুকরণে শিষ্য-প্রশিষ্য-শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত এক কবি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এই শিষ্যদলের মধ্যে সুধীরঞ্জন-প্রণেতা দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হরিমোহন সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন বসু পরবর্ত্তী সময়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পদ্মিনীর উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিয়ৎপরিমাণে গুরুর পদবী অতিক্রম করিয়া কিছু মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কবিতা এক সময় বঙ্গদেশের পাঠকবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। আমাদের যৌবনকালে যে সকল ব্যক্তির প্রতিভা আমাদিগকে কাব্যজগতে প্রবেশ করিবার জন্য উন্মুখ করিয়াছিল, তন্মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক ১৮৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ড-পীড়ন" নামক এক পত্র বাহির করেন। "ভাস্কর" পত্রের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "রসরাজ" পত্রের সহিত কবিতাযুদ্ধ ও গালাগালি করা ঐ "পাষণ্ড-পীড়নের" প্রধান কার্য্য হইয়া উঠে। তখন বঙ্গীয় আসরে প্রতিনিয়ত যে কবির লড়াই চলিত, সাহিত্যক্ষেত্রে সেই কবির লড়াইকে অবতীর্ণ করা উক্ত পত্রদ্বয়ের উদ্দেশ্য ছিল। সে অভদ্র, অশ্লীল, ব্রীড়াজনক উক্তি প্রত্যুক্তির বিষয় স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা হয়। ইহাতে বঙ্গ-সাহিত্যজগতে এরূপ অশ্লীলতার স্রোত বহিয়াছিল, যাহার অনুরূপ নিকৃষ্ট রুচি আর কোনও দেশের ইতিবৃত্তে দেখা যায় না। প্রকাশ্য পত্রে যে সে সকল বিষয় কিরূপে প্রকাশিত হইত তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

সুখের বিষয় যে বাঙ্গালা ১২৫৪ সালের মধ্যেই পাষণ্ড-পীড়ন উঠিয়া যায়।

বোধ হয় পাঠকবর্গের বিরক্তিই তাহার প্রধান কারণ হইয়া থাকিবে। কারণ ঐ ১২৫৪ সালেই ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এখানিতে তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। এই পত্র বহুদিন জীবিত ছিল। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র এক একখানি স্থূলকায় মাসিক প্রভাকর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনচরিত সম্বলিত গ্রন্থাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশ। ১২৬৪ সালে 'প্রবোধপ্রভাকর' নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি আর দুইটী কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রথম, বঙ্গীয় কবিগণের জীবন-চরিত ও কাব্যসংগ্রহ। দ্বিতীয়, শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা অনুবাদ। এই উভয় কার্য্যেই তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রভূত পরিশ্রমও করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার দেহান্ত হয়। ১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক 'প্রভাকর' প্রকাশ করিবার পরই তিনি কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন, এবং সেই জ্বরেই ১০ই মাঘ দিবসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন মৃত্যুশয্যাতে শয়ান, তখন মধুসূদন লোকচক্ষের অগোচরে থাকিয়া প্রতিভা-বলে উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য দুরন্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। মধুসূদন যশোর জেলাস্থ সাগরদাঁড়ী নামক গ্রামবাসী রাজ-নারায়ণ দত্তের পুত্র। তাঁহার পিতা কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন; এবং তদুপলক্ষে কলিকাতার উপনগরবর্ত্তী খিদিরপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। ইংরাজী ১৮২৪ সালে, ২৫ জানুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জননী জাহ্নবী দাসী কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। জাহ্নবীর জীবদ্দশাতেই বিলাস-পরায়ণ রাজনারায়ণ আর তিনটী বিবাহ করিয়াছিলেন। দুইটী সহোদর ভ্রাতার অকালে মৃত্যু হওয়ায় মধুসূদন স্বীয় জননীর একমাত্র পুত্র ছিলেন। সুতরাং তিনি শৈশবা-বধি মায়ের অঞ্চলের নিধি, আদুরে ছেলে ছিলেন। রাজনারায়ণের অর্থের অভাব ছিল না; সুতরাং অর্থের দ্বারা সন্তানকে যতদূর আদর দেওয়া যায়,

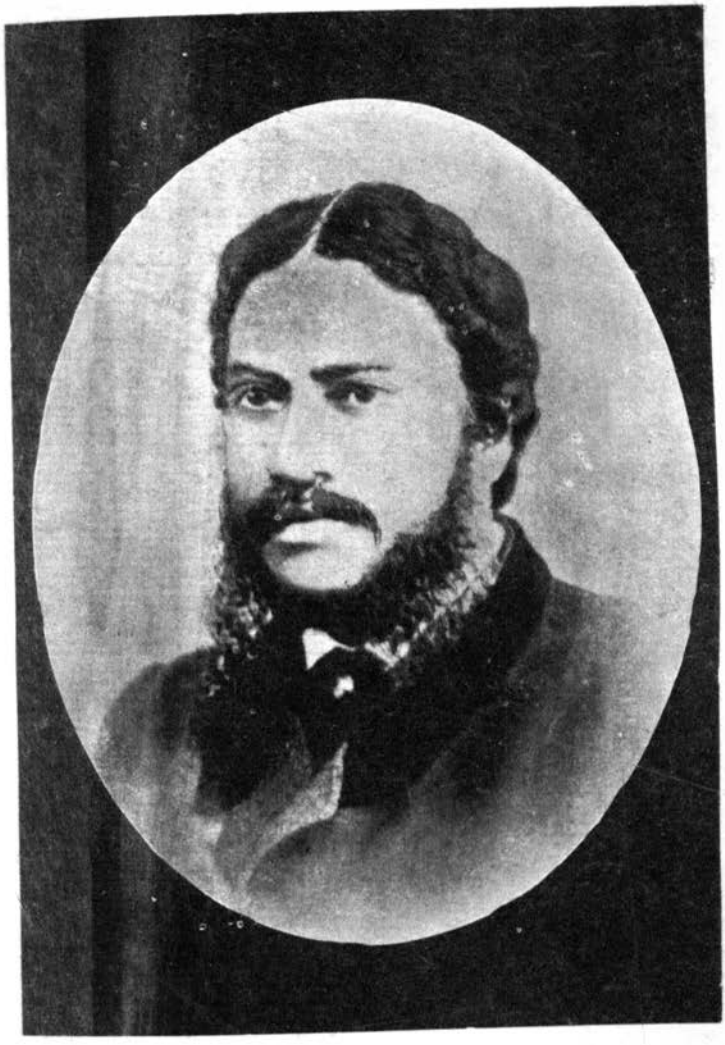

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

(২৩২ পৃষ্ঠা)

B. Kar Bee Press.

মধুসূদনের পিতামাতা পুত্রকে তাহা দিতে কখনই কৃপণতা করিতেন না। মধুসূদন প্রথমে সাগরদাঁড়ীতে জননীর নিকট থাকিয়া পাঠশালাতে বিদ্যা-শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১২। ১৩ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিজের খিদিরপুরের বাটীতে আনিয়া হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কালেজে পদার্পণ করিবামাত্র মধুসূদনের আশ্চর্য্য ধীশক্তি সকলের গোচর হইল। তিনি ১৮৩৭ সালে কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত তথায় পাঠ করিয়াছিলেন। এই অল্পকালের মধ্যে সিনিয়ার স্কলার্শিপের শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করেন; এবং সকল শ্রেণীতেই অগ্রগণ্য বালকদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়া-ছিলেন। সে সময়ে যাঁহারা তাঁহার সমাধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহারা বলেন যে তিনি গণিত বিদ্যায় একেবারে অবহেলা প্রকাশ করিতেন এবং কাব্য ও ইতিহাস পাঠেই অধিক মনোযোগী ছিলেন। আদুরে ছেলের চরিত্রে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা এ সময়ে তাঁহার চরিত্রে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইত। তিনি অমিতব্যয়ী, বিলাসী, আমোদ-প্রিয়, কাব্যানুরাগী ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি প্রীতি-মান ছিলেন। ধুলিমুষ্টির ন্যায় অর্থমুষ্টি ব্যয় করিতেন। সে সময়ে সুরাপান ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একটা সৎসাহসের কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল; মধুসূদনের সময়ে কালেজের অনেক ছাত্র সুরাপান করাকে বাহাদুরির কাজ মনে করিত। মধু তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অপরাপর অসমসাহসিক পাপকার্য্যেও তিনি লিপ্ত হইতেন। পিতামাতা দেখিয়াও দেখিতেন না; বরং অর্থ যোগাইয়া প্রকারান্তরে উৎসাহদান করিতেন। যাহা হউক, বিবিধ উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও মধুসূদন জ্ঞানানুশীলনে কখনই অমনোযোগী হইতেন না। কালেজে তিনি কাপ্তেন রিচার্ডসনের নিকট ইংরাজী-সাহিত্য পাঠ করিতেন। সৎক্ষেত্রে পতিত কৃষির ন্যায় রিচার্ডসনের কাব্যানুরাগ মধুর হৃদয়ে পড়িয়া সুন্দর ফল উৎপন্ন করিয়াছিল। তিনি ছাত্রা-বস্থাতেই ইংরাজী কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রতিভার শক্তি কোথায় যাইবে! সেই ইংরাজী কবিতাগুলিতে তাঁহার যথেষ্ট কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

কবিতারচনাতে ও পাঠ্যবিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব দেখিয়া সকলেই অনু-মান করিতেন যে মধু কালে দেশের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইবেন। মধুর পিতামাতাও বোধ হয় সেই আশা করিতেন। কিন্তু যে প্রতিভার গুণে মধু অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিতেন, সেই প্রতিভাই

তাঁহাকে সুস্থির থাকিতে দিল না। যৌবনের উন্মেষ হইতে না হইতে তাঁহার আভ্যন্তরীণ শক্তি তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। গতানুগতিকের চিরপ্রাপ্ত বীথিকা তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিল। দশজনে যাহা করিতেছে, দশজনে যাহাতে সন্তুষ্ট আছে, তাহা তাঁহার পক্ষে ঘৃণার বস্তু হইয়া উঠিল; তাঁহার প্রকৃতি নূতন ক্ষেত্র, নূতন কাজ, নূতন উত্তেজনার জন্য লালায়িত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে তাঁহার জনকজননী তাঁহার এক বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। একটী আট বৎসরের বালিকা, যাহাকে চিনি না জানি না, তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে, এই চিন্তা মধুকে ক্ষিপ্ত-প্রায় করিয়া তুলিল। তিনি পলায়নের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পলাইবেন কোথায়? একেবারে বিলাতে! তাহা না হইলে আর প্রতিভার খেয়াল কি! কার সঙ্গে যাইবেন, টাকা কে দিবে, সেখানে গিয়া কি করিবেন, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই; যখন পলাইতে হইবেই, তখন দেশ ছাড়িয়া একেবারে বিলাতে পলানই ভাল! পরামর্শ স্থির আগে হইল, টাকার চিন্তা পরে আসিল। 'টাকা কোথায় পাই, বাবা জানিলে দিবেন না, মার নিকটেও পাইব না, আর ত কাহাকেও কোথায়ও দেখি না।' শেষে মনে হইল মিশনারি-দিগের শরণাপন্ন হই, দেখি তাঁহারা কিছু করিতে পারেন কি না। গেলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে; তিনি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন যে তাঁহার মনে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ অপেক্ষা বিলাত যাওয়ায় বাতিকটাই বেশী। এইরূপে আরও কয়েক দ্বারে ফিরিলেন। শেষে কি হইল, কি দেখিলেন, কি শুনিলেন, কি ভাবিলেন, কি বুঝিলেন, তাঁহার বন্ধুরা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

১৮৪৩ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে বন্ধুগণের মধ্যে জনরব হইল যে, মধু খ্রীষ্টান হইবার জন্য মিশনারিদিগের নিকট গিয়াছে। অমনি সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হিন্দুকালেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ও সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান উকীল রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র খ্রীষ্টান হইতে যায়—এই সংবাদে সকলের মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। রাজনারায়ণ পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টার অবধি রাখিলেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। উক্ত সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি তাঁহার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের মনে কিরূপ আঘাত লাগিল। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে অর্থ-

সাহায্য করিতে বিরত হইলেন না। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মধু হিন্দু-কালেজ পরিত্যাগ করিলেন এবং বিধিমতে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য বিশপস্ কালেজে প্রবেশ করিলেন। এখানে তিনি ১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৪৭ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন ; এবং এখানে অবস্থানকালে হিব্রু, গ্রীক্, লাটিন প্রভৃতি নানা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশপস্ কালেজেই বা কে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখে ? তাঁহার বিলাতগমনের খেয়ালটার যে কি হইল তাহার প্রকাশ নাই ; কিন্তু বঙ্গদেশ তাঁহার পক্ষে আবার অসহ্য হইয়া উঠিল। আবার গতানুগতিকের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিল ; অবশেষে একদিন কাহাকেও সংবাদ না দিয়া একজন সহাধ্যায়ী বন্ধুর সহিত মান্দ্রাজে পলাইয়া গেলেন।

মান্দ্রাজে গিয়া তিনি এক নূতন অভাবের মধ্যে পড়িলেন। অর্থের জন্য তাঁহাকে কখনও চিন্তিত হইতে হয় নাই। দেশে থাকিতে পিতামাতা তাঁহার সকল অভাব দূর করিতেন। সেখানে তাঁহাকে নিজের উদরান্ন নিজে উপার্জ্জন করিতে হইল। কিন্তু তিনি ইংরাজী রচনাতে যেরূপ পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার কাজের অভাব হইল না। তিনি মান্দ্রাজ সহরের ইংরাজ-সম্পাদিত কতকগুলি সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল। ১৮৪৯ সালে "Captive Lady" নামে একখানি ইংরাজী পদ্যগ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। তাহাতে তাঁহার কবিত্বশক্তির ও ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রশংসা হইল। কিন্তু মহাত্মা বেথুনের ন্যায় ভাল ভাল ইংরাজগণ তাহা দেখিয়া বলিলেন যে বিদেশীয়ের পক্ষে ইংরাজী কবিতা লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করা মহা ভ্রম ; তদপেক্ষা এরূপ প্রতিভা স্বদেশীয় ভাষাতে নিয়োজিত হইলে দেশের অনেক উপকার হইতে পারে।

তাঁহার প্রতিভা আবার তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সেখানে একজন ইংরাজমহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর একটী ইংরাজমহিলাকে পত্নীভাবে লইয়া ১৮৫৬ সালে, আবার দেশে পলাইয়া আসিলেন। কিন্তু হায় দেশে আসিয়া কি পরিবর্ত্তনই দেখিলেন ! পিতা মাতা এ জগতে নাই ; আত্মীয় স্বজন বিধর্ম্মী বলিয়া তাঁহাকে মন হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন ; পৈতৃক সম্পত্তি অপরেরা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে ; বাল্যসুহৃদ ও সহাধ্যায়িগণ তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন ;

এবং নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন; নব্যবঙ্গের রঙ্গভূমিতে নূতন একদল নেতা আসিয়াছেন, তাঁহাদের ভাব গতি অন্য প্রকার; এইরূপে মধুসূদন স্বদেশে আসিয়াও যেন বিদেশীয়দিগের মধ্যে পড়িলেন। এই অবস্থাতে তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বসাকের সাহায্যে কলিকাতা পুলিস আদালতে ইণ্টারপ্রিটারি কর্ম্ম পাইয়া, তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

কিরূপে তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বাবু তাঁহাকে পাইকপাড়ার রাজাদ্বয়ের ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরিচিত করিয়া দেন, কিরূপে তাঁহারা সংস্কৃত রত্নাবলী নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ করাইয়া বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ে তাহার অভিনয় করান ও তৎ-সূত্রে উক্ত অনুবাদের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া কিরূপে মধুসূদন শিক্ষিত-ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত হন, তাহা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি। বলিতে কি ঐ রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদ মধুসূদনের প্রতিভা বিকাশের হেতুভূত হইল। তিনি সংস্কৃত নাটক রচনার রীতির দোষগুণ ভাল করিয়া অনুভব করিলেন; এবং এক নবপ্রণালীতে বাঙ্গালা নাটক রচনার বাসনা তাঁহার অন্তরে উদিত হইল। তিনি তদনুসারে ১৮৫৮ সালে "শর্ম্মিষ্ঠা" নামক নাটক রচনা করিয়া মুদ্রিত করিলেন। মহা সমারোহে তাহা বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ে অভিনীত হইল। তৎপরেই মধুসূদন প্রাচীন গ্রীসদেশীয় পুরাণ অবলম্বন করিয়া "পদ্মাবতী" নামে আর একখানি নাটক রচনা করেন। এই উভয় গ্রন্থে তিনি যশোলাভে কৃতকার্য্য হইয়া বাঙ্গালা ভাষাতে গ্রন্থ রচনা বিষয়ে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। ইহার পরেই তিনি "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়োশালিকের ঘাড়ের রোঁ" নামে দুই খানি প্রহসন রচনা করেন। তৎ-পরে ১৮৬০ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামক পত্রে তাঁহার নব অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রণীত "তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়; এবং অল্পকাল পরেই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। তিলোত্তমা বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন পথ আবিষ্কার করিল। বঙ্গীয় পাঠকগণ নূতন ছন্দ, নূতন ভাব, নূতন ওজস্বিতা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মধুসূদনের নাম ও কীর্ত্তি সর্ব্বসাধারণের আলোচনার বিষয় হইল।

ইহার পরে তিনি "মেঘনাদবধ" কাব্য রচনাতে প্রবৃত্ত হন। ইহাই বঙ্গ-

সাহিত্য সিংহাসনে তাঁহার আসন চিরদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার জীবনচরিতকার সত্যকথাই বলিয়াছেন, এবং আমাদেরও ইহা অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় যে তাঁহার লেখনী যখন "মেঘনাদের" বীররস চিত্রনে নিযুক্ত ছিল, তখন সেই লেখনীই অপরদিকে "ব্রজাঙ্গনার" সুললিত মধুর রস চিত্রনে ব্যাপৃত ছিল। এই ঘটনা তাঁহার প্রতিভাকে কি অপূর্ব্ববেশে আমাদের নিকট আনিতেছে! একই চিত্রকর একই সময়ে কিরূপে এরূপ দুইটী চিত্র চিত্রিত করিতে পারে! দেখিয়া মনে হয়, মধুসূদনের নিজ প্রকৃতিকে দ্বিভাগ করিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। তাহার জন্যই বোধ হয় এত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে, এত ঘনঘোর বিষাদের মধ্যে, এত জীবনব্যাপী অতৃপ্তি ও অশান্তির মধ্যে বসিয়া তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিয়াছেন!

যাহা হউক তিনি কলিকাতাতে আসিয়া একদিকে যেমন কাব্য-জগতে নবযুগ আনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অপরদিকে জ্ঞাতিগণের হস্ত হইতে নিজ প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে এ কথা নিশ্চিত, যে তিনি যাহা কিছু পাইয়াছিলেন ও যাহা কিছু নিজে উপার্জ্জন করিতেন, হিসাব করিয়া চলিতে পারিলে তাহাতেই একপ্রকার দিন চলিবার কথা ছিল। কিন্তু পিতামাতার যে আদুরে ছেলে জীবনে একদিনের জন্য আয় ব্যয়ের সমতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, সে আজ তাহা করিবে কিরূপে? কিছুতেই মধুর দুঃখ ঘুচিত না। প্রবৃত্তিকে যে কিরূপে শাসনে রাখিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। মনে করিতেন প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই সুখ। রাবণ তাঁহার আদর্শ, "ভিখারী রাঘব" নহে; সুতরাং হস্তে অর্থ আসিলেই তাহা প্রবৃত্তির অনলে আহুতির ন্যায় যাইত! সুখের জোয়ার দুইদিনের মধ্যে ফুরাইয়া, মধু ভাঁটার কাটখানার মত, যে চড়ার উপরে সেই চড়ার উপরে পড়িয়া থাকিতেন! কেহ কি মনে করিতেছেন ঘৃণার ভাবে এই সকল কথা বলিতেছি? তা নয়। এই সরস্বতীর বরপুত্রের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়া চক্ষের জল রাখিতে পারি না; অথচ এই কাব্যকাননের কলকণ্ঠ কোকিলকে ভাল না বাসিয়াও থাকিতে পারি না। অন্ততঃ তাঁহাতে একটা ছিল না; প্রদর্শনের ইচ্ছা ছিল না। কপটতা বা ভণ্ডামির বিন্দুমাত্র ছিল না। এই জন্য মধুকে ভালবাসি। আর একটা কথা, এমন প্রাণের তাজা ভালবাসা মানুষকে অতি অল্পলোকেই দেয়, এজন্যও মধুকে ভালবাসি।

মধুসূদনের প্রতিভা আবার তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ইংরাজ কবি সেক্সপীয়র বলিয়াছেন 'কবিগণ পাগলের সামিল।' তাই বটে; ১৮৬১ সালে মধুসূদনের মাথায় একটা নূতন পাগলামি বুদ্ধি আসিল। সেটা এই যে তিনি বিলাতে গিয়া বারিষ্টার হইবেন। লোকে বলিতে পারেন, এটা আবার পাগলামি কি? এত সদ্‌বুদ্ধি। যদি এ পৃথিবীতে বারিষ্টারি করিবার অনুপযুক্ত কোনও লোক জন্মিয়া থাকেন, তিনি মধুসূদন দত্ত। তাঁহার প্রকৃতির অস্থি মজ্জাতে বারিষ্টারির বিপরীত বস্তু ছিল; আইন আদালতের গতি লক্ষ্য করা, মক্কেলদিগের কাছে বাঁধা থাকা, নিয়মিত সময়ে নিয়মিত কাজ করা, তিনি ইহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা বুঝিলেন না। ১৮৬২ সালের জুনমাসের প্রারম্ভে পত্নী ও শিশু কন্যা ও পুত্রকে রাখিয়া বারিষ্টার হইবার উদ্দেশে বিলাত যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া ৫ বৎসর ছিলেন। এই পাঁচ বৎসর তাঁহার দারিদ্র্যের ও কষ্টের সীমা পরিসীমা ছিল না। যাহাদের প্রতি নিজের বিষয় রক্ষা ও অর্থসংগ্রহের ভার দিয়া গিয়াছিলেন, এবং যাহাদের মুখাপেক্ষা করিয়া স্ত্রী পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা সে বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিল না। হায়! দেশের কি অধোগতিই হইয়াছে! তাঁহার স্ত্রী পুত্র কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া ১৮৬৩ সালে বিলাতে তাঁহার নিকট পলাইয়া গেল। তাহাতে তাঁহার ব্যয়বৃদ্ধি হইয়া দারিদ্র্য ক্লেশ বাড়িয়া গেল। তিনি ইংলণ্ডে প্রাণধারণ করা অসম্ভব দেখিয়া, ফরাসিদেশে পলাইয়া গেলেন। সেখানে ঋণদায় ও কয়েদের ভয়ে তাঁহার দিন অতিকষ্টেই কাটিতে লাগিল। অনেক দিন সপরিবারে অনাহারে বাস করিতে হইতে; প্রতিবেশিগণের মধ্যে দয়াশীল ব্যক্তিদিগের সাহায্যে সে ক্লেশ হইতে উদ্ধার লাভ করিতেন। এরূপ অবস্থাতেও তিনি কবিতা রচনাতে বিরত হন নাই। এই সময়েই তাঁহার "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" রচিত হয়। ইহাই তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার শেষফল বলিলে হয়। ইহার পরেও তিনি কোন কোনও বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে পারেন নাই।

বিদেশবাসের দুঃখ কষ্টের মধ্যে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দুঃখের কথা জানিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। যথা সময়ে তাঁহার সাহায্য না পাইলে, আর তাঁহার দেশে ফিরিয়া আসা হইত না। যাহা হউক তিনি উক্ত মহাত্মার সাহায্যে রক্ষা পাইয়া কোনও প্রকারে

বারিষ্টারিতে উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। বারিষ্টারি কার্য্যে সুদক্ষ হইবার উপযুক্ত বিদ্যা বুদ্ধি তাঁর ছিল, ছিল না কেবল স্থিরচিত্ততা। তাঁহার মনের স্থিতি-স্থাপকতা শক্তি যেন অসীম ছিল। তিনি দুঃখের মধ্যে যখন পড়িতেন, তখন ভাবিতেন, আপনার প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া চলিবেন, কিন্তু স্কন্ধের জোয়ালটা একটু নামাইলেই নিজ মূর্ত্তি ধরিতেন, আবার সুখের আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেন। দেশে যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার নাম সম্ভ্রম আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, সাহায্য করিবার লোক আছে, যদি আপনাকে একটু সংযত করিয়া, নিজ কর্ত্তব্যে মন দিয়া বসিতেন, বারিষ্টারিতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন। কিন্তু পাগলা কীটে তাঁহাকে সুস্থির বা সংযত হইতে দিল না। তিনি কয়েক বৎসর নানাস্থানে ঘুরিয়া নিজ অবস্থার উন্নতির জন্য বিফল চেষ্টা করিলেন। অবশেষে ১৮৭৩ সালের জুন মাসে নিতান্ত দৈন্যদশায় উপায়ান্তর না দেখিয়া কলিকাতা আলিপুরের জেনারেল হস্পিটাল নামক হাঁসপাতালে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা তখন মৃত্যুশয্যায় শয়ানা! মধুসূদনের মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে হেনরিয়েটার মৃত্যু হইল। মৃত্যুশয্যাতে সমগ্র জীবনের ছবি মধুসূদনের স্মৃতিতে উদিত হইয়া তাঁহাকে অধীর করিয়াছিল। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকাইয়া তাঁহার নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মে অবিচলিত বিশ্বাস স্বীকার পূর্ব্বক ও পরমেশ্বরের নিকট নিজ দুষ্কৃতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দেহত্যাগ করেন। ১৮৭৩ সাল, ২৯ শে জুন রবিবার, তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করেন।

যে ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত কালকে বঙ্গসমাজের মাহেন্দ্রক্ষণ বলিয়াছি, সেই কালের মধ্যে আর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যে যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি দেখা দিয়াছিলেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দিব। এক্ষণে এই কালের অন্তর্গত দুই একটী ঘটনা আনুষঙ্গিকরূপে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কালা আইন (Black Acts) এর আন্দোলনের উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি। সে আন্দোলন একবার উঠিয়া থামিয়াছিল মাত্র। ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে আবার সেই আন্দোলন উঠে। অনেক দিন হইতে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ, এবং হাইকোর্টের জজগণ অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন, যে মফস্বলবাসী ইংরাজদিগকে সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির ফৌজদারি আদালতের অধীন না করিলে, এদেশীয় গরীব প্রজাদিগের উপরে তাঁহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে